পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণদিগের রীতিনীতি, তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান

ও

লোকাচার সংক্রান্ত নিরপেক্ষ পর্যেষণা

রুশ গবেষকের দৃষ্টিতে অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষ

গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেভ

পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণদিগের রীতিনীতি, তাহাদিগের পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও লোকাচার সংক্রান্ত নিরপেক্ষ পর্যেষণা

রুশ থেকে বাংলা অনুবাদ

ডঃ স্মিতা সেনগুপ্ত ও ডঃ অর্চন সরকার
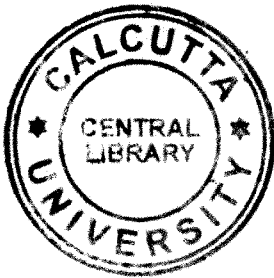
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০১৩

উৎসর্গ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
ভাষা সংগীত নাট্যকর্মে এবং লেবেদেভ চর্চায়
ব্যাপৃত মানুষদেরকে

—অনুবাদকদ্বয়

পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণদিগের রীতিনীতি, তাহাদিগের পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান
ও লোকাচার সংক্রান্ত নিরপেক্ষ পর্যেষণা

purba bharater brahmandiger ritiniti, tahadiger pabitra dharmiya
anushthan o lokachar sankranta niropekhya parjeshona

Герасим Лебедев

Беспристрастное Созерцание Систем Восточной Индии

Брагменов, Священных Обрядов их и народных обычаев.

На языке бенгали.

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

শব্দগ্রন্থন ঃ বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ (২৪৬০-২৫৭৩)

PUBLISHED BY THE REGISTRAR, UNIVERSITY OF CALCUTTA,
87/1, COLLEGE STREET, KOLKATA - 700 073

AND

PRINTED BY SRI PRADIP KUMAR GHOSH,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, CALCUTTA - 700 019

প্রাপ্তিস্থান ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিক্রয় কেন্দ্র
৮৭/১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

মূল্য ঃ ১০০ টাকা

লেখক ও তাঁর বই সম্বন্ধে

মনে হতে পারে যে, রুশিদের ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানার জন্য আজ থেকে দু' শতাব্দী আগে প্রকাশিত ইয়ারোস্লাভলবাসীর লেখা বইয়ের প্রতি নজর দেওয়ার আবশ্যকতা নেই, কারণ আজ তাদের কাছে ভারত সম্বন্ধে যে কোন তথ্য জানার জন্য রয়েছে অনেক বেশি ও ক্রমবর্ধমান সুযোগসুবিধা। তা সত্ত্বেও, এই বই নিজের মূল্য আজও বজায় রেখেছে। আধুনিক পাঠক অন্য যুগের রুশি লোকের দৃষ্টিতে দেখতে পাবেন পূর্ব ভারতকে, অনুভব করতে পারবেন দেশের এই অংশের নিখুঁত বিবরণে তাঁর ভাষার বর্ণময়তা, গভীর তাৎপর্য ও চিত্রকল্প।

গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেভ (১৭৪৯-১৮১৭) নিজের বইয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও তার বিভিন্ন অংশ প্রকাশের জন্য তৈরি করেছিলেন বিশ বছর ধরে, তার মধ্যে দশ বছর ছিলেন কলকাতায়, আর এই সৌভাগ্যক্রমে খুলে যাওয়া সুযোগকে ব্যবহার করেছিলেন ভারতীয় ভাষা শিক্ষায়, ব্রাহ্মণদের পবিত্র সাহিত্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও লোকাচার সম্বন্ধে জানার কাজে।

যদি মনোযোগ দিয়ে দেখা হয় যে, আফানাসি নিকিতিনের "তিন সমুদ্র পারের যাত্রা" নিয়ে এন. এম. কারামজিনের লেখা প্রকাশিত হয় লেবেদেভের "নিরপেক্ষ পর্যেষণা" বইটি প্রকাশিত (১৮০৫) হওয়ার বারো বছর পরে ও তভের শহরের বণিকের দিনলিপি প্রকাশিত হয় এর ষোলো বছর পরে ১৮২১ সালে, তবে আমাদের ভূমিপুত্রের রচনাকে ঊনবিংশ শতকে ভারতবর্ষ ও তার সংস্কৃতি নিয়ে রুশ ভাষায় লেখা প্রথম বর্ণনা বলে মানতেই হবে (১)।

এখানে যোগ করব যে, তভেরবাসী আ. নিকিতিন, যাঁর নাম আজ রাশিয়ার সমস্ত লোকই জানেন, তিনি এক ভুলে যাওয়া সাম্রাজ্যে তাঁর নিজের জীবনযাপনের গল্প করেছেন, আর সেই সাম্রাজ্য, তাঁর স্মৃতিকথা প্রকাশের সময়ের অনেক আগেই ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছিল। পরে আ. নিকিতিনের দিনলিপি প্রকাশিত ও পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল বহুবার। লেবেদেভের বই কিন্তু বইয়ের তালিকায় বিরল নাম হিসেবেই রয়ে গিয়েছিল, আর তাঁর নাম আজও সীমাবদ্ধ বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই; যদিও ঊনবিংশ-শতকের শুরুতে সবই ছিল অন্যরকম, তবুও তাঁর সমসাময়িকেরা "নিরপেক্ষ পর্যেষণা" বইটির কিন্তু যথাযোগ্য মূল্যায়ন করেছিলেন।

লেবেদেভের বইটি সম্রাট (জার) প্রথম আলেকজান্ডারের প্রতি উৎসর্গপত্র দিয়ে শুরু হয়েছে। সেই সময় রাশিয়াতে এই ধরনের উৎসর্গীকরণ সরকারি প্রথা হিসাবেই ধরা হত। আইনের নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী বই লেখা হলে তা পরীক্ষা করে দেখা হত, তারপরে বইয়ের লেখকের যোগ্যতা লিখিতভাবে সম্রাটের মুহুরি দফতরে

পাঠানো হত। এরপর, আবার ওপর থেকে নীচে, ''সর্বোচ্চ অনুমোদন'' পেয়ে তার উত্তর আসত লেখকের কাছে নিজের উদ্যোগে লেখা পাঠানোর জন্য, তখনকার কথায় ''সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায়''।

লেবেদেভ রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এশিয়া বিভাগে কাজ করতেন। সুতরাং তাঁর রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মতামত ওই বিভাগের প্রধান এবং বৈদেশিক পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের রাষ্ট্রীয় উপাচার্য এ. র. ভবোন্তসভের পক্ষ থেকেই গিয়েছিল। অন্যভাবে বলতে হলে, ''নিরপেক্ষ পর্যেষণা'' বইটিতে, স্বদেশের সামনে লেবেদেভের কীর্তির সরকারি স্বীকৃতিলাভের বাঁধাধরা প্রথা হিসাবেই সম্রাটকে উৎসর্গপত্র লেখা হয়েছিল।

সেই সময়ে রাশিয়াতে তাঁর সমকক্ষ ভারত বিশেষজ্ঞ কেউই ছিলেন না। পিটার্সবার্গের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতেও ওই দেশের মানুষের ভাষা জানা কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায় নি। সাধারণত ওই দেশ সম্বন্ধে তথ্য তখন প্রাথমিকভাবে ইংরাজি ভাষায় লেখা বইয়ের অনুবাদ হিসাবেই পাওয়া যেত। লেবেদেভের কাজের ফলে রুশ দেশে ভারতচর্চার ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে প্রধানত ছিল বই, তাঁর অন্যান্য রচনা পাণ্ডুলিপি হিসাবেই রয়ে গিয়েছিল। তাঁর অসুস্থতা ও মৃত্যুর কারণে সেইগুলোর প্রকাশ সম্ভবপর হয়নি।

তাঁর স্বাস্থ্য অনেকটাই ভারতবর্ষে দীর্ঘ দিন থাকার কারণে নষ্ট হয়েছিল। ''...এই বইতে লিপিবদ্ধ বিষয়গুলির মধ্যে প্রবেশ ও অনুধাবন করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া আমি সেইস্থানে নিজের পুঁজি ও জীবন ব্যয়ের কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছি'', এই কথা তিনি বইয়ের উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন (পৃঃ ২৪)।

লেবেদেভ কারণ বর্ণনা করেছেন, যা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ''অন্তরের গভীর হইতে নিরলস অধ্যবসায়ের সহিত'' এই ধরনের কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য। তিনি বইটির উপর কাজ করেছেন এই আশা নিয়ে যে, তা ''জাতিগুলির মধ্যে কাম্য পারস্পারিক বন্ধুপ্রীতি'' স্থাপনে ও ''সর্বজনীন শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধি পুনর্স্থাপনে'' কাজে লাগবে (পৃঃ২৫)

তাঁর রচনার নামকরণ হয়েছিল পূর্ব ভারতের নামে, তাই মনে হয় তাঁর পূর্ব ভারতে বসবাস সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। লেবেদেভ যখন ভারতে এসেছিলেন (১৭৮৫), তখন এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ তিনটি প্রদেশে বা প্রেসিডেন্সিতে বিভক্ত ছিল, যাদের মধ্যে কোনও পারস্পরিক সীমানা ছিল না— বাংলা, মাদ্রাজ ও বম্বে। এর মধ্যে বাংলাকেই প্রধান ধরা হত, যার কেন্দ্র ছিল কলকাতা। এখানেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদর দফতর, গভর্নর জেনারেলের বাসভবন, হাইকোর্ট, এককথায় বিশাল অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসনের সমস্ত দফতরই ছিল, যার মালিক ও সর্বময় কর্তা ছিল কোম্পানি। ভারতে প্রেরিত ইংরেজ সামরিক বাহিনী ছাড়া, সমস্ত অসামরিক ও সামরিক পদে নিয়োগের অধিকার লন্ডনে অবস্থিত এই কোম্পানির বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্সের হাতে ছিল।

লেবেদেভ বাংলায় আসার আগের দু'বছর যেখানে অতিবাহিত করেছিলেন, সেই মাদ্রাজের তুলনায় কলকাতার ইউরোপীয় কলোনিতে লোকের সংখ্যা বহুগুণ বেশি ছিল। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, তিনি ''উচ্ছ্বসিত'' হয়েছিলেন অন্য জায়গায় আসতে নিজের রোজগার বাড়ানোর ''সদ উদ্দেশ্য বিনা নহে'' ''চরম সুখদায়ক যেই স্থানে প্রায় সমস্ত জাতির অসংখ্য আগন্তুক দ্রুত প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।'' (২)

শুরুতে কলকাতায় তাঁর জীবন মাদ্রাজের মতোই ''সুসংহত ও উপভোগ্য'' হবার সম্ভাবনা ছিল, যেখানে তিনি তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার কারণে সেখানের ইউরোপীয়দের কাছ থেকে তাঁর নিজের কথাতেই ''মুক্ত হস্তে খরচ করিবার উপযুক্ত জোগান'' পেতেন। লেবেদেভ স্বীকার করেছিলেন যে, কলকাতায় ''আমার সঙ্গীত আমাকে অনেক বেশি লাভজনক অবস্থায় আনিয়া দিয়াছিল।'' (পৃঃ ২৮)

ইংরেজদের ব্যক্তিগত বাসভবনে, যাদের মধ্যে ছিলেন কোম্পানির কর্মী, পদাধিকারী সামরিক ও বিচারালয়ের কর্মী, বাণিজ্য সংস্থার প্রতিনিধি ও অন্যান্যরা, তাঁকে বাজানোর, সঙ্গীতশিক্ষা দেওয়ার, এককভাবে জলসা করার জন্য অনবরত আমন্ত্রণ জানাতেন। কিছুদিনের মধ্যে লেবেদেভ উচ্চপদস্থ পৃষ্ঠপোষকদের তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার গুণগ্রাহী হিসাবে পেয়ে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলার রাজ্যপাল গভর্নর জেনারেল জে. শোর, কলকাতার মেয়র এ. কিড, হাইকোর্টের বিচারক জে. হাউড, কর্নেল এইচ. গ্রিন ও আরও অনেকে, যাঁদের সম্পর্কে তিনি পরে বলেছিলেন, "এঁরা এত বেশি সংখ্যক, যে প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব।" (৩)

লেবেদেভ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের পরে ভাড়া করা ফ্ল্যাট ছেড়ে একটি আরামদায়ক বাড়িতে এসে ওঠেন, এই বাড়িটা তিনি কলকাতার সেন্ট জন স্কটিশ চার্চের কাছে এক শান্ত অভিজাত এলাকায় লিজ নেন। বাড়ির দেখাশোনার ভার ন্যস্ত ছিল এক ভারতীয় ম্যানেজার বা সরকারের হাতে; তা না হলে কোনও মালিকই বিদেশিকে নিজের সম্পত্তি লিজ দিত না। সরকারের আবশ্যিকতা ছিল বাড়ির অন্যান্য কাজের লোক ঠিক করা ও তাদের কাজ তদারকির জন্য, যাদের না হলে সাদা চামড়ার সাহেবদের তখন চলত না। সেই সময়ের পক্ষে খুবই অসম্ভব ছিল ভাবা যে, তিনি নিজে রান্না করে খাবেন অথবা কলকাতার রাস্তায় পায়ে হেঁটে চলাফেরা করবেন। যদি মনে রাখা হয় যে, জাতপাতের নিষেধের কারণে সেই সময়ে ভৃত্যদের মধ্যে একজনও অন্যের কাজ করতে চাইত না, তাহলে বিদেশি, যে বাড়ি লিজ নিয়েছে, তাকে বাড়ির সঙ্গে বাড়তি হিসাবে একসাঙ্গে অসংখ্য বাড়ির কাজের লোকও নিতে হত। যা থেকে লেবেদেভের সংক্ষেপে বলা কথা "সেই স্থানে আগত বিদেশিদের জীবনযাপনের নিমিত্ত কত কিছুর প্রয়োজন ছিল।" অনুমান করা কষ্টকর নয় (পৃঃ ৯২)।

কলকাতায় স্বাচ্ছন্দ্যে ও সরকারবাবুর যত্নে লেবেদেভের জীবনের আটটি বছর কেটেছিল। উচ্চপদস্থ পৃষ্ঠপোষকদের দল, যাঁরা "সমস্ত রকমের আতিথ্য ও বদান্যতা" দিয়ে তাঁর সঙ্গীতকলার মূল্য দিয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা কমতে শুরু করে যেই তিনি "হিন্দুস্থানি ভাষাগুলি" অধ্যয়নে তাঁর সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন।

স্থানীয় ভাষাগুলো আয়ত্ত করার জন্য ও বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন রচনাগুলো অনুবাদের জন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে নিজেদের কর্মচারীদের বড় রকমের অর্থ পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা হত, কিন্তু বাইরের কারও এই ক্ষেত্রে ঢোকার চেষ্টাকে, ভদ্রভাবে বললে, মোটেও সমর্থন করা হত না। নিজের একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে লেবেদেভ জানিয়েছেন: "... কলিকাতায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, এই কারণে যে, বিজ্ঞানে একজন ভিনদেশির সমকক্ষতা ইংরেজ অনুবাদকদিগের পক্ষে অসহনীয়, ব্যবসায়ীদিগের জন্য অপ্রীতিকর ও বণিক কোম্পানির সরকারি প্রশাসন নিজ দেশের লোকদিগকে অন্য জাতির ভাষা শিখিতে সমর্থন করিবার জন্য ভিনদেশি কাহারও এইরূপ সফলতা কোনও ভাবেই চাহে না।" (৪)

যে "সমর্থনের" কথা উনি বলেছেন, আর্থিক মূল্যে তা ছিল বার্ষিক এক হাজার পাউন্ড পুরস্কার। তাই, যদি সকলে নাও হয়, তবুও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অনেক পদাধিকারীই, লেবেদেভের ব্যঙ্গোক্তি অনুযায়ী " কোম্পানির চোষকেরা" (৫), অন্তত ভাসা ভাসা সংস্কৃত জ্ঞান আয়ত্ত করে নিজেদের আয় কয়েকগুণ বাড়ানোর চেষ্টায় ছিল। এখান থেকেই তাদের বিরক্তি, শুরুতে প্রচ্ছন্ন অভিমান প্রকাশ যে, নিজের বন্ধুদের বাড়িতে সঙ্গীত জলসার আনন্দকে অবহেলা করার পেছনে তাঁর "হিন্দুস্থানি ভাষাগুলির গভীর ও নিরলস অধ্যয়ন" (৬)।

লেবেদেভের সঙ্গে কলকাতার ইংরেজ প্রভুদের সম্পর্ক চিরকালের মতো নষ্ট হয় ১৭৯৫ সালে, যখন তিনি সেই সময়ের জন্য অভাবনীয় কাণ্ড করে বসলেন; বাংলা ভাষায় আধুনিক নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য থিয়েটার খুললেন। তিনি এই বইয়ের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন সেই অভাবনীয় সাফল্যের কথা, যা তাঁর নাটক অর্জন করেছিল, তা ইংরেজদের সঙ্গত কারণেই উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল (৭)।

কোম্পানির নিজস্ব থিয়েটার ছিল; তাতে অনেক বড় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মালিকানার অংশ ছিল, আর সেই সোনার ফসল, যা তারা বিনা ঝামেলায় আত্মসাৎ করতেন লেবেদেভের থিয়েটার হওয়ার আগে, তা তাঁরা হারাতে চাননি (৮)। বোধগম্য কারণেই তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা কলকাতার প্রশাসনও সহ্য করতে পারছিল না। ইংল্যান্ড ভারতীয়দের উপর তাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব চাপিয়ে দিতে চাইছিল। লেবেদেভের তৈরি থিয়েটার ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে সাম্য, সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনার ধারণাকেই স্বীকৃতি দিয়েছিল, যা ছিল ইংরেজদের জাতীয় অহঙ্কারকে প্রায় অপমান করার শামিল (৯)।

থিয়েটার বন্ধ করে দিতে প্রশাসন অবশ্যই পারছিল না। সেটা শুধু তাদেরই নয়, এমনকি গোটা জাতিরই তাতে দুর্নাম হত, যে জাতিকে লেবেদেভ যেমন ব্যাঙ্গোক্তি করে বলেছেন, "অন্যদিগ অপেক্ষা বেশি পক্ষপাতহীন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়া থাকে।" (১০)

তাই লেবেদেভ ও তাঁর থিয়েটারকে নিঃসম্বল করে দেওয়ার জন্য "কোম্পানির চোষক" শ্রেণি ও আদালতের কুচক্রীরা প্রবল চেষ্টা শুরু করেছিল। শুরু হয়েছিল চক্রান্ত, মিথ্যা মামলা, তদন্ত, গ্রেফতার, আর শেষে, একেবারেই ন্যক্কারজনক কার্যকলাপ—থিয়েটার পুড়িয়ে দেওয়া, অভিনেতাদের ঘুষ দেওয়া ও দল ভেঙে দেওয়া (১১)।

তুষারবলের মতো বেড়ে চলা অন্তহীন মামলার খরচ লেবেদেভকে থিয়েটার বন্ধ করার মতো অবমাননাকর কাজ শুরু করতে এবং থিয়েটারের যন্ত্রপাতি বিক্রি করে দিতে (১৭৯৭ সালের মে মাসের শুরুতে) বাধ্য করেছিল। কিন্তু যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল, খরচ মেটাবার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না, ইতোমধ্যে আবার সামনে নতুন মামলার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল। থিয়েটারের জন্য ভাড়া করা বাড়ির মালিক, মালি ও বাজনদারেরা বকেয়া পাওনার জন্য মামলা করেছিল। যদিও বাস্তবে লেবেদেভ তাদের কিছুই দিতে বাধ্য ছিলেন না (১২)।

দেউলিয়া হওয়ার অর্থ তাঁর জন্য শুধু শেষ সঞ্চয় হারানোই ছিল না, বরং হাজতবাসের শাস্তিও হতে পারত। কিছু প্রভাবশালী ইংরেজের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা তখনও না হারিয়ে, ভালো কিছু হওয়ার লক্ষণ না দেখে সেইসব লোকের সহায়তায়, যাঁদের তিনি নিজের "পরিচিত" বলে অভিহিত করেছেন, লেবেদেভ পরিস্থিতির জট ছাড়িয়ে বের হতে চেষ্টা করেছিলেন।

নিদারুণ অর্থসঙ্কটে পড়ে, তিনি শহরের মেয়র এ. কিড, যাঁর ছেলেকে তিনি সাড়ে পাঁচ বছর ধরে সঙ্গীত-শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং এফ. গ্ল্যাডউইন, সেই সময়ে যিনি কোম্পানির কালেক্টরেট দফতর (রাজস্ব আদায়কারী) তিনি উচ্চপদে বহাল ছিলেন, তাঁর বাড়িতেও ইনি তত বছর ধরেই বিভিন্ন জলসায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের দ্বারস্থ হয়ে নিজের দেনাগুলো, যথাক্রমে: ৪৭৫৫ ও ১৮০০ টাকা মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু উচ্চপদস্থ "পরিচিতরা" তাঁকে এই ব্যাপারে প্রত্যাখ্যান করলেন; তাঁরা উল্লিখিত অর্থ শোধও করেননি ও লেবেদেভ যেখানে বিচারের আশা করে আরজি জানিয়েছিলেন, সেই আদালতের খরচও দেননি। "নিজের সমস্ত প্রত্যাশার পরিবর্তে, আমি দেখিতেছি যে, আইন, পৃথিবীর এই গোলার্ধে আইনভঙ্গকারীদিগের প্রতিই অধিক সদয়"—কলকাতা হাইকোর্টে বিচারব্যবস্থার বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি এই খেদোক্তি করেছিলেন (১৩)।

গভর্নর জেনারেল জে. শোর তাঁর ''পরিচিতদের'' মধ্যে একমাত্র, যিনি তাঁকে রক্ষা না করলেও, তাঁর ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি অন্তত সহযোগিতা করেছিলেন। লেবেদেভ ১৭৯৭ সালের ২৩ নভেম্বর তাঁর কাছে এই ব্যাপারে সহায়তা প্রার্থনা করে অনুরোধ করেছিলেন। দু'দিনে সমস্যার সমাধান হয়েছিল। যে জাহাজের যাত্রী হিসাবে তিনি ইউরোপে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, সেই জাহাজের মালিক ছিল কোম্পানি, কিন্তু এতে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আপত্তি করেনি। লক্ষ্যসাধন হয়েছিল: থিয়েটারের আর অস্তিত্ব রইল না, তার নির্দেশক ''দারিদ্র্যে জর্জরিত'' ও ভগ্নোদ্যম, তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, আর জাহাজে তাঁর জীবন যাতে নরকবাসে পরিণত হয়, জাহাজের ক্যাপ্টেন ভি. টমসন সেই ব্যবস্থা নিজের হাতে নিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড ফেরার পথে উত্তমাশা অন্তরিপে লেবেদেভকে দেখে ইউ. এফ. লিসিয়ানস্কি তাঁকে এক নিঃস্ব, দুর্ভাগ্যের কারণে বিষণ্ণ স্বদেশবাসী বলে বর্ণনা করেছেন।

যাই হোক, লেবেদেভ ভারতবর্ষ থেকে কিছু মূল্যবান জিনিস নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কলকাতা ছাড়ার অল্প কয়েকদিন আগে একটি ব্যক্তিগত পত্রে তিনি বলেন: ''শুরু হইতেই আমার জানা ছিল যে, উত্তরসূরিরা ইংরাজি ভাষার জন্য নহে, বরং হিন্দুস্থানি ভাষাগুলির জন্যই আমাকে স্মরণ করিবে।'' (১৪) তাঁর এই কথাগুলো একবোরেই অতিশয়োক্তি ছিল না, তাঁর সমসাময়িক, যাঁরা এই ভাষাগুলি জানতেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা।

নব্য ভারতীয় ভাষাগুলি (প্রাকৃত ভাষাগুলি) আয়ত্ত করার চাবিকাঠি ছিল সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা ও ব্যাকরণ, যেগুলো জানার বিশেষ সুবিধা শুধু ব্রাহ্মণদেরই ছিল। তাঁরা মনে করতেন নিচু জাতের মানুষকে সংস্কৃত শেখানো ঘোরতর পাপ, আর তার চেয়েও বেশি পাপ কোনও বিদেশিকে তা শেখানো। লেবেদেভ এই বিষয়ে এরকম লিখেছিলেন: ''... তাহাদিগের প্রাচীনতম ভাষা সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঠিক তথ্য তৎকালে ইউরোপে ছিল না, এমনকি ভারতবর্ষেও, ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে এই বিষয়গুলি জানিয়া লওয়া সম্ভব নহে, যাঁহারা সেই দেশে আগত ইউরোপীয়দিগকে দেখিতেন অমানবিক অত্যাচারী হিসাবে অথবা নিজদিগের অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষদিগের ন্যায়, যাহাদের তাঁহারা গৃহ ও অঙ্গন হইতে সকল প্রকার অপবিত্র বস্তু বহন করিয়া লইয়া যাইবার কাজে ব্যবহার করিতেন।'' (পৃঃ২৬)

নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, চার বছর পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদের সমাজে একজন সংস্কৃত শিক্ষক খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা তাঁর সফল হয়নি। সঙ্কটময় ১৭৮৯ সালে, যখন লেবেদেভ খোঁজাখুঁজি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছেন, তখন বাড়ির সরকার এক শিক্ষকের সাঙ্গে তাঁর পরিচয় করে দিলেন। ব্রাহ্মণের নাম গোলোকনাথ দাশ, তিনি বাংলা, হিন্দুস্থানি, সংস্কৃত ও সম্ভবত ইংরাজেও জানতেন। তিনি লেবেদেভকে ভারতীয় ভাষাগুলো শেখাতে রাজি হয়েছিলেন এই শর্তে যে, লেবেদেভ পরিবর্তে তাঁকে ইউরোপীয় সঙ্গীত শেখাবেন। এইভাবে তাঁরা একে অপরের প্রতি ছাত্র ও শিক্ষকের অবস্থানে থেকে, প্রিয় বিষয় নিয়ে চর্চা শুরু করলেন। লেবেদেভের ভাষা নিয়ে পড়াশোনা গোলোকনাথ দাশের সঙ্গে চলেছিল তাঁর ''উপলব্ধি করিবার ঐকান্তিক আগ্রহে ব্রাহ্মণের বিদ্যায় প্রবেশের মাধ্যমে, যাহার মধ্যে প্রথমেই ছিল ঈশ্বরকে জানিবার বিদ্যা।''

''বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদিগের অধীনে আমি ব্রাহ্মণ্য বর্ণমালা, অভিধান, ব্যাকরণ, দিনপঞ্জিকা ও অন্যান্য বিষয়গুলি প্রণিধান করিলাম...'' (পৃঃ ২৮), তাঁর এই কথা বিচার করে মনে হয়, যেসব তথ্যদাতা যাঁরা তাঁকে বিষয়গুলো অধ্যয়নে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছিলেন, যে বিষয়গুলো পরবর্তীকালে তাঁর বইয়ের উপকরণ

হয়েছিল, তাঁদের পরিধি অনেকটাই প্রসারিত হয়েছিল। সেই সময়ে বিদেশির প্রতি এই ধরনের বিশ্বাস একেবারেই অশ্রুতপূর্ব ছিল। এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ যে, ইংরেজ ভি. জোনস, যিনি কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (১৭৮৪), খুবই কষ্ট করে নিজের জন্য একজন সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক, তাও আবার অব্রাহ্মণ, খুঁজে পেয়েছিলেন (১৫)।

লেবেদেভের পক্ষে তাঁদের "দেব ভাষা" সংস্কৃত যতটা আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল, তার উপর ভিত্তি করে "ব্রাহ্মণ্যবিদ্যা" আয়ত্তের দ্বিতীয় পথ ছিল লিখিত মূল রচনাগুলো পড়া। নিজের বইতে তিনি ধর্মীয় দর্শন-সাহিত্য "বেদান্ত", পুরাণ ও এইগুলোর টীকার উল্লেখ করেছেন। টীকাকাররা সম্ভবত বাংলায় প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত হতেন (পৃঃ ৩১)।

যেহেতু মূল রচনাগুলোর ভাষার ওপর লেবেদেভের দখল সীমাবদ্ধ ছিল, তাই তিনি সেগুলো তাঁর ভারতীয় উপদেষ্টাদের সহায়তায় পাঠ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে যতদূর সংস্কৃত ভাষা শিখতে পেরেছিলেন সেই অনুযায়ী তাঁর পক্ষে অনেকটাই নিজে পড়া সম্ভব হয়েছিল। লেবেদেভ ক্রটিহীনভাবে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করতে পারেননি; তিনি এই মর্মে নিজে বলেছেন: "...আমি যতদূর পারিয়াছি সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াছি।" (১৬) তা সত্ত্বেও তাঁর উপলব্ধি যথেষ্ট ছিল, যা দিয়ে তিনি হিন্দুদের পবিত্র পুথি থেকে নিজের জন্য "জ্ঞানের গুপ্ত ভাণ্ডার" আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত কিছু সংস্কৃত গ্রন্থও ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ১৭৯৪ সালে ব্যক্তিগত পত্রাবলির একটিতে ভি. জোনসের প্রকাশিত মনুর ধর্মশাস্ত্রের (মনুসংহিতা) উল্লেখ করেছিলেন (১৭), আর নিজের বইটিতে তিনি প্রাচীন পুঁথির সারাংশ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেটি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল (পৃঃ ৪৬)।

লেবেদেভ সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণের প্রশ্ন নিয়ে জার্নালে বিতর্ক শুরু করার প্রস্তাব দিয়ে একটি চিঠি এই সোসাইটির সভাপতি জে. শোরের নামে পাঠাতে চেয়েছিলেন, যিনি ভি. জোনসের (মৃত্যু ১৭৯৪) পরিবর্তে এই পদে বহাল হয়েছিলেন। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত হতে পারত রুশ বর্ণমালা, লাতিন নয়। কিন্তু সেটা ছিল ১৭৯৭ সাল, আর তিনি, ভারতীয় বন্ধুদের পরামর্শে, এই চিঠি আর পাঠাননি, যাতে আরও একটি সাহসী প্রকল্পের দরুন তাঁর শোচনীয় অবস্থা আরও জটিল না হয়।

বাংলা জ্ঞান দিয়ে লেবেদেভ তাঁর উপদেষ্টা পণ্ডিতদের অবাক করে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটিয়েছিলেন, যখন তিনি গোলোকনাথ দাশের কাছে তিন বছর পড়াশোনা করার পর দুটো ইংরেজি প্রহসনের অনুবাদ তাঁদের মাতৃভাষাতে নিজে অনুবাদ করে দেখিয়েছিলেন (এই দুটোই বাংলা কৌতুক নাটকের ধরনে তাঁর থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল)। কলকাতার হিন্দুস্থানি, জীবন্ত "বাজারের ভাষা", তিনি একেবারে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, লন্ডনে (১৮০১) এই ভাষার ব্যাকরণ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করে তিনি পরে ইউরোপীয়দেরও অবাক করে দিতে পেরেছিলেন।

বাংলা ভাষা ও কলকাতার হিন্দুস্থানি ভাষায় সাবলীল জ্ঞান থাকার সুবাদে তিনি বিভিন্ন পেশার ভারতীয়দের সঙ্গে, বহু সামাজিক গোষ্ঠীর ও বর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিলেন, যারা তাঁকে, তাঁর সমসাময়িক বঙ্গসমাজের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই তথ্যগুলো ও যা তিনি নিজে

দেখেছিলেন, তার সম্মিলিত রূপ বইটির তৃতীয় ভাগে প্রতিফলিত হয়েছে, যার অধ্যায়গুলোতে লেবেদেভ বর্ণনা করেছেন ভারতীয়দের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর সংক্ষেপে এই দেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণসহ গল্প করেছেন "পূর্ব ভারতের প্রাচুর্যের" কথায়। ভারতীয় জীবনধারার যে দিক নিয়েই তিনি ভাবনাচিন্তা করেছেন, তাঁর বিচার-বিবেচনা যথার্থ, নিরপেক্ষ ও মানবিকতায় স্বতন্ত্র।

লেবেদেভ একেশ্বরবাদী "বেদান্ত" অনুসারী ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণার পর্যালোচনা দিয়ে নিজের রচনা শুরু করেছেন। "প্রকৃত হিন্দু" ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন: "তাহারা খ্রিস্টধর্মের গোঁড়া বিশ্বাসীদিগের মতোই এক পরম ঈশ্বরের সাধনা করিয়া থাকেন, যাঁহার নাম তাহারা দিয়াছেন ব্রহ্মা, যিনি স্বর্গ, মর্ত ও সকল প্রকার দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জীবের স্রষ্টা। একই সঙ্গে তাঁহারা অবিমিশ্র ও একই মৌলিক সত্তাবিশিষ্ট ত্রিত্বকেও, যাঁহাদিগকে তাঁহারা নিজদিগের ভাষায় ত্রোইকো বলিয়া থাকেন ও ঈশ্বরের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণকারী কৃষ্ণকেও স্বীকার করেন..." (পৃঃ ২৯)। অন্য একটি জায়গায় তিনি লিখেছেন: "... উহাদের বর্তমান ধর্মবিশ্বাস, তাহা আর অন্য কিছুই নহে, উহাদের পূর্বসূরিদিগের ও আগত ভিন্ন স্থানের মানুষদিগের কতিপয় অন্ধবিশ্বাসের সমন্বয়ে এক ভ্রান্তি সৃষ্টিকারি খ্রিস্টধর্ম ..." (পৃঃ ৫৩)।

লেবেদেভ কী কারণে দু'টি ধর্মকে তুলনা করায় উদ্যোগী হয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করেননি। শুধু ধারণা করা যেতে পারে যে, তাঁর সময়ে, ভারতবর্ষ মানবজাতির জন্মভূমি ও ভারতের ব্রাহ্মণদের প্রাচীন কথ্য ভাষা (সংস্কৃত) সকল ভাষার উৎস—এই বহুল প্রচলিত তত্ত্বের সমর্থক হওয়ার কারণে, তিনি ভাবতেন যে, খ্রিস্টীয় ধারণা এখানে ইউরোপের আগেই উদ্ভব হয়েছিল। তাঁর এইরকম ব্যাখ্যাও দেখা যায়: "তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন এক পরম ঈশ্বরকে ও বহু ইউরোপীয়দিগের পূর্বেই খ্রিস্টীয় নীতি ধারণ করিয়াছিলেন। শুধুমাত্র এই পার্থক্য যে, মূর্তিপূজা সংক্রান্ত অবশিষ্ট কুসংস্কার উহাদিগের মধ্যে স্বল্পবিস্তর রহিয়া গিয়াছে..." (পৃঃ ৮৯)।

ভারতীয়দের কাছে সময়ের দিক থেকে তাঁর (পরমেশ্বরের) পূর্ববর্তিতা বা অগ্রগণ্যতার আভাস পাঠক এই বইয়ের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখতে পাবেন, যেখানে লেখক বিবৃত করেছেন ব্রহ্মা সম্পর্কে হিন্দু শিক্ষা, যেখানে ব্রহ্মা প্রাথমিক কারণ রূপে, বিষ্ণু দ্বিতীয় শক্তি রূপে ও শিব তৃতীয় শক্তি রূপে একক ঐশ্বরিক সত্তায় মূর্ত। ভারতীয়রা, "আমাদিগেরই ন্যায় একেশ্বরে বিশ্বাস করিয়া, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে অবিভাজ্য ও অবিমিশ্র ত্রিরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন: সৃষ্টি, রক্ষা তদ্রূপ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পুনর্নবীকরণেরও দায়িত্ব পবিত্র ত্রিত্বে ন্যস্ত ও তাঁহার প্রতিটি রূপ সমপরিমাণ নিজস্ব ক্ষমতা ও শক্তিসম্পন্ন।" (পৃঃ ৩৮)

লেবেদেভ ভারতীয়দের ধর্মকে খ্রিস্টানদের ধর্মশিক্ষার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্ম অর্থাৎ সেই বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করেছেন, যা তাঁর ও তাঁর পাঠকদের সবচেয়ে বেশি বোধগম্য বিষয়। হিন্দুধর্মে অনুমোদিত দেবদেবীর ছবিকে তিনি "আইকন" বলেছেন, তিনি হিন্দু দেবদেবীদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মের পরিভাষায় (তাঁর ভাষায় দেবদূত) হিন্দু দরবেশদের বলেছেন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি সংক্রান্ত পৌরাণিক বর্ণনাগুলোকে বাইবেলের বর্ণনার যতদূর সম্ভব কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের অধ্যায়গুলোতে, যেখানে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি, ধর্ম, সৃষ্টিতত্ত্ব, মহাবিশ্বের গঠনতত্ত্বের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে পাঠক এই ধরনের তুলনা কম খুঁজে পাবেন না। এটা বোঝা যায় যে, লেখকের অর্থোডক্স খ্রিস্টান বোধে হিন্দুদের ধর্ম যথোপযুক্ত চিত্রকল্প ও ধারণার মাধ্যমে প্রতিসারিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে অনিচ্ছাকৃতভাবেই চিন্তার উদ্রেক হয় যে, তিনি বিনা কারণে সেগুলোকে অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মের ভাষায় "ভাষান্তর" করেননি।

এটাকে, আজকের যুগে হলে বলা হত সাহিত্যিক কৌশল, যার সাহায্যে তিনি তাঁর দেশবাসীকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজে স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সামনে উপস্থিত এক প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন (১৮), আর ইংরেজদের তীব্র ভাষায় দোষারোপ করেছেন, তাদের ওই দেশের লোকেদের অসভ্য বলে অবজ্ঞা করতে দেখে: "...ভারতীয়গণ কিয়দংশেও বর্বরদিগের ন্যায় নহেন ও তাঁহাদিগের যথার্থ কারণ রহিয়াছে উহাদিগকে নিন্দা করিবার যাহারা তাঁহাদিগের সহিত সর্বাপেক্ষা রক্তলোলুপ, হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে।" (পৃঃ ৮৯)

লেবেদেভের লেখা ভারতীয় মহাকাশবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তাঁর বাংলা পঞ্জিকার ব্যাখ্যা (বইয়ের দ্বিতীয় ভাগের ৩-৫ অধ্যায়) সংক্ষিপ্ত। সম্ভবত তিনি তাঁর বইটি প্রকাশের সময়ের মধ্যে বিষয়গুলো ছাপার জন্য তৈরি করে উঠতে পারেননি। কিন্তু এইসব ছোট অধ্যায় থেকেও চিন্তাশীল পাঠক নিজের জন্য অনেক আকর্ষণীয় বিষয় খুঁজে পাবেন। যেমন, হিন্দুদের সপ্তাহের দিনগুলোর নাম—এগুলো পরিচিত জ্যোতিষ্কগুলোর নাম। ভস্করেসেনিয়ে (রুশ ভাষায়)—ভারতীয় ভাষায় এতবার বা রবিবার, অর্থাৎ সূর্যের দিন, পনেদিয়েলনিক—চাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত (সোম), ফেতারনিক—মঙ্গলের, সুব্বোতা বা শনিবারে সপ্তাহ শেষ হয়, সেটা শনি গ্রহের দিন (পৃঃ ৬২-৬৩)।

আর নক্ষত্রগুলোকে তাঁরা সন্ধ্যার ও দিনের নক্ষত্র হিসাবে ভাগ করেন। সন্ধ্যাবেলার নক্ষত্রদের মধ্যে তাঁদের এমন কয়েকটা নক্ষত্র রয়েছে, "যেগুলিকে পুরুষ ও অন্যগুলিকে স্ত্রী নক্ষত্র হিসাবে মান্য করা হইয়া থাকে।" (পৃঃ ৬৭) সেগুলোর বিয়ে হয়, তারা দেবদেবীদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হয় ও বংশবৃদ্ধি করে থাকে। যেমন রোহিণী—ব্রহ্মার স্ত্রী, পুনর্বসু—অসুরের স্ত্রী (পৃঃ ৪৭), কার্তিক (কার্তিকেয়)— শিবের পুত্র, যাঁকে আবার এই বইয়ের পাঠক অন্য এক পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন যে, তিনি মৃগশিরা নক্ষত্রকে বিয়ে করেছেন ইত্যাদি (পৃঃ ৫২-৫৩, ৬৫)।

চতুর্থ অধ্যায়ে পাঠক জানতে পারবেন যে, ভারতীয়রা বছরকে ছয়টি ভাগে (ঋতু) ভাগ করে থাকেন, ইউরোপীয়দের মতো চারটি ভাগে নয়। একেকটা ঋতুতে দুটো করে সৌর মাস, প্রত্যেক ঋতুর আবার নিজের নিয়ন্ত্রক বা পর্যবেক্ষক হিসাবে একজন করে পুরুষ অথবা স্ত্রীলিঙ্গের আধ্যাত্মিক সত্তা রয়েছে (পৃঃ ৬৮)।

লেবেদেভের মন্তব্য অনুযায়ী, ইউরোপীয়দের কাছে ভারতীয়দের রূপকধর্মী চিত্র খুবই অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু তা, "সংস্কৃত ভাষায়... অজ্ঞতা হেতু, সেই কারণে তাহারা সেগুলির তাৎপর্যের গভীরে প্রবেশ করিতে পারিত না।" লেবেদেভের এই মন্তব্যের সঙ্গে বিখ্যাত খরেজমবাসী, যিনি রুশ ভ্রমণকারীর ভারত ভ্রমণের সাত শতক আগে ভারতে জীবনযাপন করেছিলেন, তাঁর উক্তি যোগ করলে বোধহয় বাহুল্য হবে না: "যদি তুমি ভারতীয় ধর্মীয় কাহিনিগুলির সহিত গ্রিক ধর্মীয় কাহিনিগুলির তুলনা করো, তাহা হইলে সেগুলি আর তোমার নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে না।" (১৯)

পাঠক জ্যোতির্বিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব অথবা বর্ণমালা সংক্রান্ত আংশিক বিষয় যেগুলো শুধু বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে, বাদ দিয়ে পড়লে ক্ষতি নেই, কিন্তু লেবেদেভের হিন্দু পঞ্জিকা ও তার বর্ণনার অংশ (রুশী) পাঠকের নিজের কাজে ব্যবহারযোগ্য না হয়ে যায় না, যেখানে চান্দ্র মাসগুলোকে ইউরোপীয় মাসগুলোর সঙ্গে তুলনা করে দেখানো হয়েছে। মনে করা যাক, কেউ কলকাতায় তৃতীয় চান্দ্র আষাঢ় মাসে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন, তাঁর জন্য সহজ করে বললে, সেখানে খুব একটা ভালো সময় হবে না। কিন্তু পঞ্চম চান্দ্র মাসে (ভাদ্র)

ইউরোপীয় ক্যালেন্ডারের কিছুটা অগাস্ট মাস ও কিছুটা সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে, ভ্রমণ ও নির্দিষ্ট কাজে যাওয়ার জন্য খুবই উপযুক্ত মাস, আর প্রথম (বৈশাখ) ও দ্বিতীয় (জ্যৈষ্ঠ) মাস, এপ্রিল থেকে মে মাস ও মে থেকে জুন মাস, বিশ্রাম ও প্রমোদের জন্য ভালো (পৃঃ ৭৩)। (সম্ভবত সেই সময় মে-জুন মাসের গরমে তত কষ্ট হত না—অনুবাদক)।

লেবেদেভ জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পঞ্জিকার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। রাশিয়াতে যেসব পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ তিনি নিয়ে এসেছিলেন, সেই সাতটি হাতে লেখা সংগ্রহের মধ্যে চারটে ছিল পঞ্জিকা (ক্যালেন্ডার)। তার মধ্যে দুটোতে নানা রকমের লেখা বিচার করে দেখে মনে হয়েছে যে, তিনি স্বদেশে ফিরে এসেও ওইগুলো নিয়ে কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন (২০)।

তাঁর বইয়ের তৃতীয় ভাগের প্রথম তিনটি অধ্যায় ও পঞ্চম অধ্যায়ে হিন্দুদের আচার, মন্দির, সেইগুলোর অলঙ্করণ, প্রধান উৎসব, প্রথা, ঐতিহ্য ও বঙালিদের জীবনের বর্ণনা দেওয়া রয়েছে। এই সমস্ত বিবরণের সঙ্গে খুব অল্প কিছুই আজ যোগ করা সম্ভব। শুধু এইটুকুই যে, কালীঘাট, যেখানে "প্রাজ্ঞতার প্রতিমূর্তি দুর্গার (কালী)" মূর্তি রয়েছে ও যা সম্বন্ধে লেবেদেভ উল্লেখ করেছেন, সেখানে এখনও কার্তিক মাসে তাঁর সময়ে ভক্তসমাগমের চেয়ে কম ভক্ত আসেন না (পৃঃ ৮৫)।

চতুর্থ অধ্যায়ে লেবেদেভ বাংলার বর্ণবৈষম্যের বর্ণনা, জাতের তালিকা ও তার সঙ্গে জড়িত পেশার বিবরণ দিয়েছেন। যদি তাঁর দেওয়া পরিভাষা (শ্রেণি, উপাধি, পদমর্যাদা ইত্যাদি) থেকে বেরিয়ে আসা হয়, তাহলে আমাদের সামনে উপস্থিত হয় এমন এক সমাজ, যার সামাজিক বুনোটের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সামাজিক পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রাধান্য পরম্পরা ঢুকে আছে।

বর্ণাশ্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সর্বাগ্রে অবস্থান ছিল। একই সঙ্গে প্রত্যেকের নিজেদের শ্রেণির (জাতেরই) ভেতরে আবার ভাগ ছিল। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ধরা হত তাঁদের যাঁরা ছিলেন সাত্ত্বিক ও জ্ঞানী, যা তাঁদের ভাষাগত শিষ্টাচারে প্রতিফলিত হত। বেদজ্ঞ, পবিত্র প্রতীক বিষয়ে জ্ঞান ও জটিল আচার অনুষ্ঠানে পারঙ্গম ব্রাহ্মণের নামের আগে যথোপযুক্ত সম্বোধন লেখা হত: "ঋষি", "প্রাজ্ঞ", "পণ্ডিতপ্রবর" ইত্যাদি, অথচ একই সময়ে গৃহের পুরোহিতকে সহজেই "পুরোহিতমশাই" (পঃ ৮৬) বলে ডাকা যেত।

ক্ষত্রিয়রা আটটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, শ্রেণিগুলোর অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করত এই বর্ণেরই অন্য শ্রেণির তুলনায় তার উঁচু বা নিচু অবস্থান।

এরপর লেবেদেভ ৩৫টি পেশা বা বৃত্তি অনুযায়ী গোষ্ঠী বর্ণনা করেছেন, যারা বিভিন্ন জাতের প্রতিনিধি। পেশার তালিকায়, ক্রম অনুযায়ী, "তৃতীয় শ্রেণিতে" মর্যাদা অনুসারে প্রথমে ছিল বৈশ্য বা ব্যবসায়ীরা, দ্বিতীয় স্থানে—কারিগরেরা (শুধু চামার বা যারা চামড়ার কাজ করত, তারা ছাড়া)। পরিষেবা—যেমন ক্ষৌরকার্য, ধোপার কাজ—এগুলো করলে বুঝতে হত যে তারা নিম্ন বর্ণভুক্ত। জাতিবিভাগের সর্বনিম্ন শ্রেণিতে ছিল জমাদারেরা, যারা পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করত (হাঁড়ি), তাদের করতে হত সবচেয়ে নোংরা কায়িক শ্রম। তাদের চেয়ে সামান্য উঁচুতে, প্রায় একই জায়গায় ছিল হাতুড়ে ডাক্তাররা ও যারা চামড়ার কাজ করত (চামারেরা), তাদেরও নোংরা জিনিস ছুঁতে হত—পশুদের কাঁটাছেড়া করা ও মৃত পশুদের চামড়া ছাড়ানোর সময় (পৃঃ ৮৭-৮৮)।

সমস্তরকম কায়িক শ্রমের মধ্যে সবথেকে মর্যাদাসম্পন্ন ছিল কৃষিকাজ। (চর্মশিল্পকে না ধরে) সমস্তরকম শিল্পকর্ম কৃষিকাজের নীচে ধরা হত। আবার কৃষকদের (রায়েতদের) মধ্যে নিজস্ব শ্রেণীবিভাগ ছিল। কেউ যদি নিজের জমিতে চাষ করত (জমির মালিক বা ভাগচাষি হিসাবে) তাহলে তার সামাজিক মর্যাদা, যে অপরের জমিতে চাষ করে তার চেয়ে উঁচুতে ধরা হত।

লেবেদেভ জাতিগত রক্ষণশীলতা ও পেশার ক্ষেত্রে পরম্পরার বিষয়টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে লিখেছেন: "... প্রত্যেক জাত বিশেষত তাহার পদবির সহিত এইরূপভাবে জড়িত, যে কোনও দিনই এক বৃত্তি হইতে অন্য বৃত্তিতে স্বেচ্ছায় যাইতে চাহিবে না", ব্যতিক্রম শুধু "বর্তমানে গাড়ি (হাঁড়ি) নামক স্বেচ্ছাচারী অস্পৃশ্য এক জাতি..." (পঃ :৮৮-৮৯)। লেবেদেভ লিখেছেন গাড়িদের (হাঁড়িদের) পূর্বসুরিরা ভারতে প্রভুত্বস্থাপনের পর বিদেশি বন্দিরা বা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত লোকজন।

বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাসী সমাজ সহ্য করত না কোনও কাজ বা পেশা বদলের মতো নিয়মের ব্যতিক্রম। মনে হয় এই প্রসঙ্গে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে কলকাতা প্রশাসনের একটা প্রচেষ্টার গল্প—"কসাইখানা তৈয়ারি... মুসলমান ও গাড়িদের (হাঁড়ি) লইয়া", যার ফলে শুধু অনেক "বিক্ষোভ আর বিশৃঙ্খলাই" হয়েছিল (পৃঃ ৯১)।

বিক্ষোভ বা ঝামেলার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। কসাইরা অস্পৃশ্যদের সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকার করল, তার উত্তরে অস্পৃশ্যরা বেঁকে বসল সেইসব পরিষেবা দিতে যা তাদের জাতের প্রধান পেশা। যেসব কারণে একটা জাত অন্য জাতের বিরুদ্ধে বয়কট ঘোষণা করল সেগুলো যথেষ্ট জটিলতা সৃষ্টি করতে পারত। অর্থাৎ কসাইরা অস্পৃশ্যদের পরিষেবা না পেলে তাদেরকে শুধুমাত্র নিজেদের বাড়ির ময়লা পরিষ্কার করতে হত তাই নয়, বাকি সব কাজও নিজেদেরই করতে হত, যেমন—বাড়ি পাহারা দেওয়া, দাড়ি না কামানো অবস্থায় রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি। কারণ, কোনো নাপিত, ধোপা বা দারোয়ান (চৌকিদার) সেই কসাইকে পরিষেবা দিত না যে নোংরা জিনিস ছুঁয়ে নিজের জাত হারিয়েছে।

একই কথা বলা যেতে পারে অন্য শ্রেণিগুলো সম্পর্কে। বণিক (সাউকার) অথবা চড়া সুদের ব্যবসায়ী তাদের জাতিগত পেশার (পাইকারী ব্যবসা অথবা খুব বড় পরিমাণ টাকা সুদে খাটানো) বদলে কম মর্যাদাসম্পন্ন কাজ, যেমন খুচরো ব্যবসা বা বাজারে বসে টাকার ভাঙানি দেওয়ার কাজ করলে তাদের সমাজেরই অন্যান্য শ্রেণির লোকেদের কাছ থেকে সমালোচনা শোনার, এমনকি একঘরে হওয়ারও সম্ভাবনা থাকত।

লেবেদেভ জাতের সঙ্গে পেশার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলেছেন, "...ব্রাহ্মণগণ... চেষ্টা করিতেন তাহাদিগের সন্তানদিগকে গভীরতম বিষয়গুলি শিখাইতে..." ক্ষত্রিয়রা ছেলেদের "তাহাদিগের উপযুক্ত সামরিক অনুশীলনে" অভ্যস্ত করে তুলতেন, মসিজীবীরা (কইতি)—বিচার সংক্রান্ত কাজকর্মে, বণিক, সদোকার লোক (সাউকারি) —"অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য জাতির সহিত পারস্পরিক বাণিজ্যে... অন্যান্য শিল্পের সহিত যাহারা যুক্ত ছিলেন তাহারাও প্রত্যেকেই নিজ শিল্প ও কারিগরিতে সময় থাকিতে শিক্ষা দিয়া নিজদিগের অবস্থার স্থিতিশীলতা দৃঢ় করিতেন যাহা হইতে তাঁহারা আত্মতুষ্টি লাভ করিতেন।" (পৃঃ ৯০-৯১)

ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক, সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তাদের ভারতীয় জমিদারি থেকে শোষিত বিপুল অঙ্কের রাজস্ব আদায়ের তথ্য। ঢাকায় "...ইংরেজ বণিকদিগের শুল্ক দফতর প্রতি

বৎসর জমির ফসল ও অন্যান্য জিনিস হইতে কম করিয়া হইলেও দুই কোটি টাকা কর আদায় করিত... বাংলা ও বাগার (বিহার) নামক প্রাচীনকালের দুই অত্যন্ত শক্তিশালী প্রাক্তন রাজ্য, যেগুলি বর্তমানে প্রদেশ বলিয়া পরিচিত, ইতিহাসজ্ঞানে পারদর্শী ইংরেজগণ কোনও প্রকারে অবগত ছিল যে, কোনও এক সময়ে পৃথিবী বিখ্যাত এই সকল ব্যবসায়ীগণ বাৎসরিক এগারো কোটি টাকা বা ১৩,৭৫০,০০০ পাউন্ড আয় করিত, কিন্তু বর্তমানে সেই সকল স্থান হইতে তাহাদিগের কত আয় হইয়া থাকে তাহা কেবলমাত্র তাহাদিগের মন্ত্রীগণই জানেন।" (পৃঃ ৯৬)

ওপরে দেওয়া তথ্য ভারতে কোম্পানির ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন সম্পর্কে রুশ সাহিত্যে প্রথম নথিভুক্ত প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য।

বইটার তৃতীয় অংশের শেষ অধ্যায়ে রয়েছে ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্যান্য দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার কথা। ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ, সুইডিশ ও অন্যান্য বিদেশিরা যেসব পণ্যসামগ্রী ভারতে আনতেন, তার একটা তালিকা তাতে রয়েছে। "ইংরেজগণ, যাহারা... ইতিমধ্যে প্রায় সমগ্র ভারতে প্রভুত্ব করিতেছে... তাহারা অনেকাংশেই রাশিয়া হইতে পাওয়া দ্রব্যসামগ্রী ভারতে আনিত... সেই সকল সামগ্রী যথা—মাস্তুল বানাইবার কাঠ, করাত, কাঠ, শণ, তুষ, জাহাজের পাল তৈয়ারির ক্যাম্বিস কাপড়, চামড়া, আলকাতরা, শুয়োরের চর্বি, লৌহ ফালি ও পাত, ইস্পাত, পেরেক, মাছের ডিম, ক্র্যানবেরি, জাম জাতীয় এক ধরনের ফল..." (পৃঃ ৯৯)

এ ছাড়া ডাচ ও সুইডিশরা রাশিয়া থেকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসত জমানো মাছের ডিম, জাহাজের পাল, দড়ি, আলকাতরা, মধু, বন্দুক, লোহা ও নানা ধরনের পুরোনো জিনিসপত্র। "ইহা হইতে কঠিন নহে দেখিতে পাওয়া, সহৃদয় দেশবাসী"—লেবেদেভ উপসংহারে লিখেছেন,—"আমরা কতগুণ লাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশিদিগের এত হাত ঘুরিয়া আমাদিগের হাতে পৌঁছাইবার ফলেয" (পৃঃ ১০০)

রাশিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ রাশিয়ার জিনিস সরাসরি ভারতে পৌঁছোতে পারছে না, এই চিন্তা লেবেদেভের মাথায় কলকাতাতেই এসেছিল। কোম্পানির কারণে যন্ত্রণা যখন চরমে তখন তাঁর পাঠানো দুটো চিঠিতে ইংল্যান্ডে রুশ রাজদূত সি. আর. ভরন্তসোভ ও দূতাবাসের চার্চের যাজক ইয়া. ই. স্মিরনোভকে তিনি অনুরোধ করেন "তিন বা দুই মাস্তুল বিশিষ্ট জাহাজের অনুমতিপত্রের নিমিত্ত আবেদন করিতে", যাতে সেগুলোতে ভারতীয় জিনিস বোঝাই করে ও "রুশ পতাকা লাগাইয়া প্রাপ্য সুবিধা পাইয়া জাহাজ দু'টিকে ভারত হইতে... পূর্ব ও ভূমধ্যসাগর হইতে... বাল্টিক সাগরের মধ্য দিয়া নেভা নদী পর্যন্ত লইয়া যাওয়া যায়..." (২১)

লেবেদেভ রুশ রাষ্ট্রদূতকে আরও একটা অনুরোধ জানান—"২০ হাজার রুবলের একটি লিখিত অনুদানের ব্যবস্থা করিতে", যার বিনিময়ে তিনি রাশিয়ায় পাঠাবার জন্য "অবিশ্বাস্য কম মূল্যে" "অধিকাংশ কেতাদুরস্ত মহিলা ও পুরুষদিগের প্রিয়" মসৃণ ও নকশা করা মসলিনের কাপড় ও অন্যান্য ভারতীয় হস্তশিল্পের জিনিস থোক বা পাইকারি কেনার কথা দিয়েছিলেন।

সি. আর. ভরন্তসোভকে তিনি চিঠিতে এ কথাও লেখেন, "যদিও আমি প্রায় নিঃস্ব কিন্তু হিন্দুস্থানের শহরগুলির বিভিন্ন বণিকের সহিত আমি পরিচিত ও চুক্তি স্বাক্ষরকারীগণের যদি আমার উপর বিশ্বাস না থাকে তাহা হইলে জিনিসগুলির মূল্য আমি নিজেই চুকাইয়া দিব।" (২২)

লেবেদেভ নিজের আর্থিক অবস্থা ঠিক করার এই পরিকল্পনার প্রস্তাব দিতে গিয়ে স্বদেশের সুবিধার কথা

ভোলেননি। "এই কথা বিচার করিয়া যে, জাহাজ ও পণ্য কিনিতে অর্থ লাগিবে না এবং রাজকোষে শুধু অর্থই বহুগুণ বাড়িবে না, পরন্তু বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রাও বৃদ্ধি পাইবে..." তিনি ইয়া. ই. স্মিরনোভকে তাড়া দিয়েছিলেন—"ঈশ্বরের দোহাই, যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহাকে অনুমতিপত্র পাঠাইতে" (২৩)

লেবেদেভ লন্ডনে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তাদের পক্ষে জাহাজে ভারত থেকে জিনিস নিয়ে যাবার অধিকার সমেত "অনুমতিপত্র বাহির করা" কঠিন ছিল না। কিন্তু দারিদ্র্যে জর্জরিত স্বদেশবাসীর নিজের পয়সায় মাল কেনার প্রতিশ্রুতি তাদের কাছে সহজ কথায় অলীক কল্পনা বলে মনে হয়েছিল। সেই একই কারণে দু' জাহাজ মাল কিনে ভরতি করানোর কাজে চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের টাকা লাগানোর সঙ্গে জড়িত ঝুঁকি স্বাভাবিকভাবেই তারা কেউ নিজের কাঁধে নিতে চাইল না।

অথচ প্রস্তাবটা মোটেই অর্থহীন ছিল না। সি. আর. ভরন্তসোভকে লেখা তাঁর চিঠির একটা বাক্য বিচার করে বোঝা যায় যে, তিনি "হিন্দুস্থানের শহরগুলির বহু ব্যবসায়ীদিগের সহিত পরিচিত", মাল কিনে জাহাজ বোঝাই করবার মতো অর্থ তার জন্য সমস্যা ছিল না ও এর জন্য তাঁর কলকাতার বাইরে যাওয়ারও প্রয়োজন ছিল না।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের শহরের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া কষ্টকর নয় হুগলি নদীর পূর্ব তীরের বাজারগুলো। এখানে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মূল বাণিজ্যিক বা ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থিত ছিল, যেখানে পূর্ব উপকূলবর্তী অঞ্চল ও মধ্য ভারতের ব্যবসায় নিয়োজিত আর্থিক লেনদেনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হত।

বাজারগুলো কলকাতাকে রফতানির মালপত্র জোগানোয় সক্রিয় বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কের মতো ছিল। বাজারগুলোর প্রতিটিতে বণিক, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের (শ্রফ) শ্রেণিবিভাগ ছিল, যাদের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান নির্ভর করত ব্যাবসায়িক লেনদেনের পরিমাণ ও বিস্তৃতির উপর। ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের নামের আগে "শেঠ" যোগ করা থাকলে তা কলকাতার বণিকসমাজের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তাদের উচ্চ মর্যাদা বোঝাত।

কোম্পানি ভারতে তাদের মালিকানাভুক্ত জমির ওপর কর আরোপ করে রায়েত এবং কৃষকদের কাছ থেকে যথাসম্ভব বেশি কর আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ শোষণ করত। কিন্তু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কোম্পানির শোষণের উপায় কমবেশি সীমিত ছিল।

তখন (সেই সময় ও তার অনেক পরেও) ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য, ফড়ে কারবার, পূর্ব উপকূলের প্রধান বন্দরে মাল পৌঁছোনো ও তার শর্ত ঠিক করত কলকাতার কয়েকজন ধনী শেঠ যাদের পাইকারি, আর্থ-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কারবারে বিশেষ দক্ষতা ছিল।

তাদের দফতরগুলো কোম্পানির দালালের ভূমিকা পালন করত, কিন্তু এই পরিষেবার জন্য কোম্পানিকে যথেষ্ট খরচ করতে হত। কোম্পানির বাণিজ্য প্রতিনিধিরা না জানত দেশটাকে, না তার ঐতিহ্য, না ভাষা। সমস্ত ব্যাপারে—তা সে মাল কেনা হোক বা তা সরবরাহের সময়, শর্ত ইত্যাদি, তারা ভারতীয় দালালদের (বানিয়া) ওপর নির্ভরশীল ছিল। ইউরোপীয়রা তাদের নাম দিয়েছিল "চতুর শয়তান"—এই নামকরণের মধ্যে রয়েছে বানিয়াদের ব্যাবসায়িক নৈপুণ্যে ইংরেজদের প্রচ্ছন্ন প্রশংসা। আঠারোশো' শতাব্দীর শেষে কোম্পানির এক বাণিজ্য প্রতিনিধি লন্ডনকে জানিয়েছিল।

"তাহাদিগের পদ্ধতি ছিল এইরূপ—ইউরোপীয় বা দেশি কেহই তাহাদিগ বিনা কোনও ব্যাবসায়িক কার্য করিবে না।"

এটা অন্যভাবেও বলা যায়। কলকাতার শেঠরা ছিল দালাল কিন্তু কোম্পানির চাকর নয়। লেবেদেভের সঙ্গে কোম্পানির শত্রুতার সম্পর্কে তাদের কিছু এসে যেত না, বরং মাল ও জাহাজ কেনার অগ্রিম টাকা তারা সানন্দে সহজ শর্তে লেবেদেভকে ঋণ দিত। দালালের ভূমিকা পালটে রাশিয়ার মাল সরবরাহকারি হিসাবে শেঠিরা চটপট নিজের বিনিয়োগের টাকা ফেরত পেতে পারত। বাজারে ধার পাওয়া কোনও সমস্যা নয়। প্রয়োজনে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা হুন্ডির সাহায্য নিত, যেটায় লেখা টাকার অঙ্কের সমপরিমাণ টাকা যে হুন্ডি দেখাত, তাকেই মহাজনরা (শ্রফরা) দিয়ে দিত।

লেবেদেভ দেশটাকে জানতেন, জানতেন তার ভাষা, কলকাতাবাসীদের চলিত কথ্য ভাষাও তার জানা ছিল। শহরের বাজারগুলো তার কাছে ছিল 'খোলা বই'-এর মতো যেটা তিনি পড়তে পারতেন, যা ইউরোপীয়রা পারত না। তিনি দাম জানতেন, জানতেন কোথায় ও কী জিনিস মস্কো পাঠানোর জন্য কেনা সম্ভব, ভারতীয় বণিকদের ব্যাবসায়িক কাজকারবার, সমস্যা, মনোভাব সম্পর্কে ভালোরকম অবহিত ছিলেন। কাজেই ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত যে, তিনি সাউকারদের (বণিক) সঙ্গে অংশীদারি ব্যাবসায়িক সম্পর্কের শর্তের ব্যাপারে মোটামুটি কথা বলে রেখেছিলেন যেগুলোর বিষয়ে তিনি তাঁর চিঠিগুলোতে লন্ডনকে জানিয়েছিলেন।

লেবেদেভ কলকাতায় রাশিয়ান জিনিস ইউরোপীয় জিনিস বিক্রি করার পদ্ধতির বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি বইতে লিখেছেন: "প্রথমে তাহারা চড়া মূল্যে প্রকাশ্য নিলামে পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহার পর যাহা পড়িয়া থাকে তাহা ন্যায্য মুল্যে দালালদিগকে দিয়া দেয়, যাহারা টাকায় অথবা ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে মূল্য চুকাইয়া থাকে।" (পৃঃ ১০০) ·

বোঝা যাচ্ছে যে, দালালের লাভ আর মাল সরবরাহকারীর লাভের পরিমাণ তুলনা করে ভারতীয় বণিকেরা লেবেদেভের উদ্যোগে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ইউরোপে ভারতীয় কাপড় রফতানির ব্যাপারে রাশিয়ার গুরুত্ব তখন ছিল সবচেয়ে বেশি। ইউরোপের বাজারে তাঁতে বোনা ভারতীয় কাপড় সস্তার মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছিল না। ১৭৬০ সাল থেকে ইংল্যান্ড, ভারত থেকে কাপড় রফতানির ক্ষেত্রে শুল্কের হার ধাপে ধাপে বাড়িয়ে চলেছিল। ফলে ভারতের মোট রফতানি থেকে কাপড় রফতানির পরিমাণের অংশ কমে যায় যা পর্যায়ক্রমে প্রভাব ফেলে বহু ভারতীয় ব্যবসায়ীর আয়ে, যারা কলকাতা বন্দর থেকে কাপড় ও কাপড়ের জিনিস সরবরাহ করতেন। এইসব ব্যাবসায়ীদের নাম আমরা জানি না, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রাশিয়ার পক্ষে সুবিধাজনক ও লাভজনক লেবেদেভের উদ্যোগে অগ্রিম দেওয়ার জন্য তাদের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। লেবেদেভ নিজের ব্যাবসায়িক সাফল্যে নিশ্চিত ছিলেন, এ ব্যাপারে তার মনে কোন্য সন্দেহ ছিল না। ধার শোধ ও সুদের টাকা বাদ দিয়েও তিনি ১০০% লাভ হিসেব করেছিলেন।

কিন্তু যেহেতু ভারত থেকে জিনিস রফতানি করার অনুমতিপত্র দেওয়ার একচেটিয়া অধিকার ব্রিটিশরাজের, তাই অনুমতিপত্র ছাড়া নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এই কারণেই লেবেদেভ তাঁর লন্ডনের পৃষ্ঠ পোষকদের "যতশীঘ্র সম্ভব অনুমতিপত্র পাইবার ব্যবস্থা করিতে" অনুরোধ করেছিলেন। ধারের ব্যাপারে বলা যায় যে, দীর্ঘ দিন কলকাতায় থাকা রুশিদের মধ্যে একমাত্র লোক হিসাবে তিনি ভালো

করেই জানতেন যে, বস্ত্র ব্যাবসায়ীদের জামিন দেখলে ধনী শেঠ "অতি অল্প সময়ে ঘণ্টায় সামান্য কথাবার্তায় এই সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিত।

যাই হোক, স.ভ. ভরন্তসোভকে লেখা চিঠিতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের তাঁর প্রতি বিশ্বাসের আভাসের কথা থেকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে বসে রুশ রাষ্ট্রদূত না পেরেছেন বুঝতে, না পেরেছেন তা যাচিয়ে দেখতে। ফলে লেবেদেভ রুশ-ভারত স্থায়ী বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর সমর্থন পাননি।

লেবেদেভ দেশে ফিরে "পূর্ব ভারতের অক্ষররীতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার সম্মানে" প্রথম আলেকজান্ডারের ১৮০২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির নির্দেশ অনুযায়ী কলেজের নির্ধারকপদে নিযুক্ত হন ও তাঁকে বিদেশ মন্ত্রকের প্রাচ্য বিভাগ পরিষদে নেওয়া হয়, যেটা কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশ মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়।

তার এক বছর আগে বাংলা হরফে ছাপায় জন্য ছাপাখানা তৈরি ও সরকারি খরচে ভারতীয় ভাষাগুলি সম্পর্কে তাঁর রচনাগুলো ছাপার জন্য সম্রাট তাঁকে দশ হাজার রুবল দেওয়ার আদেশ দেন। ১৮০৫ সালে, নেভা নদীর তীরের কাছেই শান্ত বোগাদেলনায়া নামে রাস্তায় লেবেদেভের নিজের বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় "পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণদিগের রীতিনীতি, তাহাদিগের পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও লোকাচার সংক্রান্ত নিরপেক্ষ পর্যেষণা" বইটি ছাপা হয়।

যে সাতটি রচনা প্রকাশের কথা তিনি ভেবেছিলেন, তার মধ্যে এটাই ছিল প্রথম। বাকি রচনাগুলোর তালিকা, যেগুলো লেবেদেভ ছাপার জন্য তৈরি করেছিলেন:

১. সমগ্র পূর্ব ভারতে ব্যবহৃত সংস্কৃত বর্ণমালা;

২. "বাংলা, রুশ ও ভারতীয় উপভাষায় (হিন্দুস্থানি) ৪৮ পাতার অভিধান..., বইয়ের এক-চতুর্থাংশে এক একটি বই...";

৩. "রুশ ভারতীয় ও ইংরেজিতে ৭২ পাতার বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ (এবং আঞ্চলিক উপভাষাগুলি, যেই সকল ভাষায় সারা পূর্ব ভারতে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়, বিশেষ করে ব্যবসার উদ্দেশ্যে..., বইয়ের এক-চতুর্থাংশে এক একটি বই..";

৪. "ভারতীয়, রুশ ও ইংরেজী ভাষায় ২৪ পাতার সর্বপ্রাচীন ব্রাহ্মণ্য দিনপঞ্জি, বইয়ের এক-চতুর্থাংশে এক একটি বই...";

৫. "কলকাতায় একাধিকবার উপস্থাপিত ৬০ পাতার দু'টি কমেডি...",

৬. "গীতি কাব্যের একটি খণ্ডের বাংলা ও রুশ ভাষায় ৪৮ পাতার অনুবাদ..." (২৭);

লেবেদেভের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাটি ইউরোপের প্রথম ছাপাখানা, যেখানে ভারতীয় অক্ষরে ছাপানো যেত, দ্বিতীয় ছাপাখানাটি চার বছর পরে ১৮০৮ সালে লন্ডনে চালু হয়।

স্ত্রাসবুর্গের প্রকাশকরা তাঁর ছাপাখানা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহ দেখান। তাঁরা তাঁকে প্রস্তাব দেন ছাপাখানাটা বড় করতে, যাতে সংস্কৃত ও অন্যান্য নব্য ভারতীয় ভাষায় সমস্ত জাতির চিরন্তন সাহিত্যকর্মের অনুবাদ ছাপা যায় (২৮), কিন্তু কর্মক্ষেত্র খুব বেশি কাজের চাপ থাকায় (কয়েকটি সূত্রের তথ্য অনুযায়ী লেবেদেভ ইংরেজি

থেকে অনুবাদের কাজে খুব বেশি ব্যস্ত ছিলেন) তাঁকে এই প্রস্তাব থেকে সরে আসতে হয়।

পাঠকেরা দেখতে পাবেন বাংলা হরফে ছাপানো ভারতীয় ভাষাগুলো থেকে নেওয়া শব্দ শুধুমাত্র তাঁর "নিরপেক্ষ পর্যেষণা" বইটির পাতায়। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলো প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করার কাজ এগোচ্ছিল খুব ধীরে, তা ছাড়া কাবু করা তাঁর ব্যাধি, যা তিনি করবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন তা সম্পূর্ণ করতে দেয়নি।

লেবেদেভ বাকি জীবনটা কাটিয়েছিলেন পিটার্সবার্গের বাইরে প্রায় না বেরিয়েই। ভারতে অর্জিত জ্ঞানের জন্য এশীয় দফতর, যেখানে তিনি আমৃত্যু কাজ করেছিলেন, তাঁকে কদর করত। ১৮১১ সালে লেবেদেভ রাজসভার উপদেষ্টার পদ লাভ করেন এবং ১ জানুয়ারি ১৮১৭ সালে সেন্ট ভ্লাদিমিরের নামের চতুর্থ শ্রেণির পদক পান। সেই বছরই ১৫ জুলাই লেবেদেভ মারা যান (২৯)।

তিনিই ছিলেন প্রথম এবং রুশিদের মধ্যে একমাত্র লোক, যাঁকে আজ ন্যায্যত রাশিয়াতে ভারতবিদ্যার ভিত্তিস্থাপক ও ভারতে প্রথম আধুনিক ধরনের নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এমন কোনও শিক্ষিত বাঙালি নেই যিনি তাঁর নাম জানেন না। কলকাতার সুন্দর রাস্তাগুলোর একটার নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে। ভারতবর্ষের মানুষ তাঁর কীর্তি রুশ-ভারত মৈত্রীর প্রতীক বলে মনে করেন।

ইয়ারোস্লাভলবাসী তাঁদের ভূমিপুত্রের লক্ষণীয় কীর্তির স্মৃতিতে বইটির পুনর্মুদ্রণ করে ঋণ পরিশোধ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন তাঁরাও, যাঁদের অংশগ্রহণ ও আর্থিক সহায়তা ছাড়া এই প্রকাশনাটি সম্ভব হত কি না সন্দেহ।

ভারতে থাকাকালীনই লেবেদেভ তাঁর রচনাগুলোর একটার খসড়ায় লিখেছিলেন: "...যাহাতে আমার ডদ্ঘাটনগুলির গুরুত্ব বজায় থাকে... নিরপেক্ষ পাঠককে উদ্দেশ্য করিতে পারিয়া নিজেকে সম্মানিত গণ্য করিতেছি।" (৩০) বইটির নামে "নিরপেক্ষ" শব্দটিরও অর্থ এই যে, তিনি এটিকে স্বদেশের পাঠকের দরবারে তুলে দিয়েছেন। আমরা যতদূর সম্ভব তাঁর লিখনশৈলী, ভাষা ও ভারতীয় শব্দ লেখার বিশেষত্বকে বজায় রেখে তাঁর ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা করেছি। রচনায় বড় হাতের অক্ষরগুলো তাঁর বানানরীতি অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে, যতিচিহ্নগুলো দেওয়া হয়েছে অর্থ অনুযায়ী।

বইটির বিষয় সংক্রান্ত টীকা পাঠক খুঁজে পাবেন লেখাটির শেষে। বইটির শেষে দেওয়া হয়েছে লেখকের জীবনের অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো ও তাঁর সম্পর্কে বাংলা, রুশি ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত রচনার তালিকা।

ভ.ভ. চেরনোভস্কায়া

ডি.এসসি. (ইতিহাস)

---

*২০০৯ সালে আধুনিক রুশ ভাষায় প্রকাশিত বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ অনুযায়ী লেবেদেভের উদ্ধৃতিগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হল।

টীকা

১) যে বছর লেবেদেভের বইয়ের রুশ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়, সেই বছরই সেটি জার্মান ও ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়। রুশ প্রাচ্য বিদ্যা ইতিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধাবলি, মস্কো, ১৯৫৬, পৃঃ ৬০।

২) এখানে ও পরে ''হিস্টোরিক্যাল আরখাইভ'' সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কে.এ. আন্তোনোভাকে লেখা লেবেদেভের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে দ্রষ্টব্য। মস্কো, ১৯৬৫, নং ১, পৃঃ ১৬০-১৯৫।

৩) সেখানেই পৃঃ ১৬৫।

৪) সেখানেই পৃঃ ১৭৬।

৫) রুশ প্রাচ্য বিদ্যা ইতিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধাবলি, পৃঃ ১০১।

৬) হিস্টোরিকাল আরখাইভ, পৃঃ ১৬৫।

৭) রুশ প্রাচ্য বিদ্যা ইতিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধাবলি, পঃ: ৪৬-৪৭, ৯৬-৯৭।

৮) হিস্টোরিক্যাল আরখাইভ, পৃঃ ১৬৬।

৯) সেখানেই, পৃঃ ১৭২।

১০) সেখানেই

১১) রুশ প্রাচ্য বিদ্যা ইতিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধাবলি, পৃঃ ৪৯-৫০।

১২) হিস্টোরিক্যাল আরখাইভ, পৃঃ ১৮৮-১৯১।

১৩) সেখানেই, পৃঃ ১৬৭, ১৯২।

১৪) হিস্টোরিক্যাল আরখাইভ, পৃঃ ১৭২।

১৫) রুশ প্রাচ্য বিদ্যা ইতিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধাবলি, পৃঃ ৯৯।

১৬) রুশ প্রাচ্য বিদ্যা ইতিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধাবলি, পৃঃ ১৬৮।

১৭) সেখানেই, পৃঃ ১৭২।

১৭) সেখানেই, পৃঃ ১৭৩।

১৯) উদ্ধৃতি—বিরুনি আবু রেইহান, ভারতবর্ষ। মস্কো, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৪।

২০) রুশ প্রাচ্য বিদ্যা ইতিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধাবলি, পৃঃ ৫৭।

২১) হিস্টোরিক্যাল আরখাইভ, পৃঃ ১৮৮-১৭৭।

২২) সেখানেই

২৩) সেখানেই, পৃঃ ১৭৮।

২৪) Chernovskaya Valentina. Indian Entrepreneurship: It's Past and Present. New Delhi. 2005, P. 30-39.

২৫) উক্ত রচনায়, পৃ: ৪৩।

২৬) উক্ত রচনায়, পৃঃ ৩৩।

২৭) রুশ প্রাচ্য বিদ্যা ইতিহাস (১৯ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত), মস্কো, ১৯৯০, পৃঃ ৩২২।

২৮) রুশ প্রাচ্য বিদ্যা ইতিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধাবলি, পৃঃ ৬০।

২৯) সেখানেই, পৃঃ ৫৮, ৬২, ৭০।

৩০) হিস্টোরিক্যাল আরখাইভ, পৃঃ ১৮৫।

প্রাক্কথন - ১

খুব বেশি কিছু বলতে চাই না। যেটা চাই সেটা হল, দয়া করে আপনারা সাধু ভাষায় অনুবাদ দেখে বিরক্ত হয়ে বইটা বন্ধ করে রেখে দেবেন না। বইটা হাতে এলে একটু কষ্ট করে পড়ে দেখলে, কিছু *ইন্টারেস্টিং* বিষয় নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন।

বইটার অনেক কিছুই আমাদের জানা এটা যেমন ঠিক, তেমনি আবার কিছু বিষয় আছে, যেগুলো আমাদের অজানা কারণ, আমরা অনেকেই সেগুলো নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। বইটা সাধু ভাষায় অনুবাদ করার উদ্দেশ্য একটাই-১৮০৫ সালে প্রকাশিত মূল বইটার ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা, সেই সময়কার *এসেন্স* টা ধরে রাখা। গেরাসিম লেবেদেভ বইটা লিখেছিলেন পুরোনো রুশ ভাষায়, সেই সময়কার লেখার *স্টাইল* বা বাক্যগঠনের রীতিও আজকের রুশ ভাষা থেকে অনেকটাই অন্যরকম ছিল।

লেবেদেভ কেন ভারতচর্চায় মেতে উঠেছিলেন, পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্ম, রীতিনীতি নিয়ে কেন মাথা ঘামিয়েছিলেন আর তা কতদূর তিনি বুঝেছিলেন, বিজ্ঞ, বিদগ্ধজনেরা তার নানা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। সেসব তর্কে যাব না। আশা করি বইটা পড়ার পর একটা কথা পাঠক অবশ্যই মানবেন যে, বইটার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তা ছাড়া শিক্ষিত বাঙালি লেবেদেভের নামের সঙ্গে পরিচিত প্রধানত নাটকের কারণে, কিন্তু তিনি যে আমাদের পঞ্জিকা, গ্রহ, নক্ষত্র, ধর্মীয় উৎসব—এইসব নিয়ে শুধু নিজেই পড়াশোনা করে থেমে থাকেননি এমনকি নিজের দেশবাসীকে তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভাগ দেবার জন্য একটা বই লিখেছিলেন, যেটা নিছক ভ্রমণকাহিনি নয়, সেটা জানার পর লেবেদেভের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন। অনেকেই তো আমরা বিদেশে অন্য ধর্মের লোকেদের মধ্যে থাকি, কিন্তু ক'জন আমরা অন্য ধর্মের, সংস্কৃতির খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাই? হ্যাঁ, আমরা নিজেদের সপক্ষে বলতে পারি যে, আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে *ভ্যাকুয়াম নেই* তাই আমাদের তেমন তাগিদ নেই। কিন্তু স্বীকার না করে পারছি না যে, আজ থেকে দুশো পঁচিশ বছর আগে কলকাতায় বসে হাজাররকম প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে একজন বিদেশির আমাদের দেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে তীব্র অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ পেয়ে অবাক হয়েছি, লজ্জাও পেয়েছি।

১৮০৫ সালে বইটা বেরোনোর পর লেবেদেভের ভাষায় কিছুটা পরিমার্জন করে বইটার দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৯ সালে, যাতে আজকের রুশি পাঠকের পক্ষে বোধগম্য হয়। বইটা আজ পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ছাড়া খুব সম্ভবত অন্য কোনও ইউরোপীয় বা ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়নি। বাংলায় অনুবাদ করার সময় তাই চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব তাঁর লেখার কাছাকাছি থাকতে, যাতে কোনও শব্দ বাদ না পড়ে যায়। কারণ অনেক সময়েই

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের সময় যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে, সেই ভাষার *স্টাইল* বজায় রাখতে গিয়ে অনেক দরকারি শব্দ বাদ পড়ে যায়, অনুবাদকের স্বাধীনতা খোদার ওপর খোদকারি করার শামিল। তা পছন্দ বা সমর্থন না করলেও কিছু খোদকারি করতে হয়েছে তা আগেই জানিয়ে রাখা ভালো। বইতে অনেক শব্দ আছে যেগুলো লেবেদেভ যেরকম শুনেছেন সেরকম লিখেছেন, অনেক ক্ষেত্রে তিনি শব্দের সঠিক অর্থ ধরতে পারেননি, সেসব আপাত অবোধ্য শব্দ বা বিষয়গুলোকে মোটা অক্ষরে লিখে যেগুলোর মর্মোদ্ধার করতে পেরেছি, পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য সেগুলো ()-এ দিয়েছি, আর যেগুলো পারিনি, সেগুলোর পাশে (?) চিহ্ন দিয়ে তার মর্মোদ্ধারের দায়িত্ব আপনাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি।

বইটার অনুবাদ সম্ভব হত না, যদি ইয়ারোস্লাভলের প্রফেসর চেরনোভস্কায়া, মিস্টার নিয়ানকোভস্কি ও স্পনসর মিস্টার কনস্তানতিন সোমিন এ ব্যাপারে উদ্যোগ না নিতেন। তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ মস্কোর শ্রীবিনয় শুক্লা ও মিতালী সরকারের সূত্রে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীঅর্চন সরকার অনুবাদের ব্যাপারে ও নাট্যকোষ পরিষদের সকলে প্রকাশের কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলে একার পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরো বইটা অনুবাদ করে প্রকাশ করা অসম্ভব হত। মস্কোর মিসেস ইরিনা তেনগিজোভনা, শ্রীসুমিত সেনগুপ্ত ও কলকাতার শ্রীমতী পূরবী রায়, শ্রীসন্দীপ ঘোষ বইটা অনুবাদের ব্যাপারে তাঁদের মতামত, বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়ে সাহায্য করেছেন। মিস্টার বরিস গাভ্রিলোভিচ পলিয়ানস্কি ও মস্কোর রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধেয় স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজির সাহায্য না পেলে অনুবাদে অনেক ভুল থেকে যেত। এঁদের সকলের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।

স্মিতা সেনগুপ্ত

...

প্রাক্কথন - ২

পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণ রীতিনীতি নিয়ে লেখা গেরাসিম লেবেদেভের বই যখন আমার হাতে এল, তখন আমি রুশ দেশে তাঁরই স্বভূমি ইয়ারোস্লাভল শহরে এই বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্বের সম্পর্কেই এক আলোচনাসভায়। এর পরেই বইটা অনুবাদ করার প্রস্তাবে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে হলেও সানন্দে সায় দিই। দ্বিধা এই কারণেই যে, মূল বইটি আধুনিক রুশ পাঠকের জন্য পুনঃর্মুদ্রিত হলেও, অষ্টাদশ শতকের রুশ ভাষার বাক্যরীতি, শব্দবিন্যাস তাতে প্রায় অপরিবর্তিত। তাই অনুবাদের দু'টি বছর কখনও বা খুঁজেছি রুশ ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, কখনও বা বাংলা ভাষার পৌরাণিক অভিধান। অবশেষে রুশ রঙে আঁকা বাংলা পারের প্রাচীন ছবি বাংলা ভাষায়।

প্রকৃতপক্ষেই বইটা পড়লে বোঝা যায়, বর্ণনার মূখ্য অংশ পূর্ব ভারত ও কলকাতা হলেও, লেবেদেভের চিন্তার প্রেক্ষাপট ছিল রাশিয়া। তাই রুশ দেশ ও রুশ জাতির প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও ভারতবর্ষকে জানার অপরিসীম আগ্রহের সার্থক প্রতিফলন এই বই। এক বিদেশি সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেমের এই মেলবন্ধন তার আন্তরিক চরিত্রকে আমাদের চোখে সহনশীলতার এক আদর্শ হিসাবে ধরা দেয়। যাঁরা বইটি পড়বেন, তাঁরা চেনা শহরের এক অদেখা ছবি দেখতে পাবেন বলেই আমার ধারণা। কেননা এক বিদেশির কৌতূহলী চোখের আলোয় আমাদের চোখের বাইরে দেখা এক ছবি। রুশ ভাষা জানার সুবাদে সেই ছবি হৃদঙ্গয়ম করার আনন্দ আমার ও স্মিতার একটু বেশি। কিন্তু এ কেবলই ছবি নয়, ইতিহাসও। দু'দেশের বন্ধুত্বের ইতিহাসকে আরও এগিয়ে দিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রুশ প্রকাশনা সংস্থা অ্যাকাডিমিয়া রাজভিচিয়ার উদ্যোগে রুশ গবেষকের ভারত দর্শনের বাংলা রূপান্তর। ২০১১ সালে সংস্থার কর্ণধার মিখাইল নিয়ানকোভস্কি, ইতিহাসবিদ ভ্যালেন্তিনা চেরনোভস্কায়া ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাশের উপস্থিতিতে এক আলোচনায় বইটির প্রকাশ সংক্রান্ত চুক্তির কথা চূড়ান্ত হয়। ইয়ারোস্লাভের এই দুই প্রতিনিধির সঙ্গে আমার পরিচয় স্মিতার মাধ্যমে। এঁরা ছাড়া যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেবেদেভ-চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁরা হলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি ভাষা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ গুণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ইয়ারোস্লাভ শহরের ডেপুটি মেয়র ভ.ভ. স্লেপস্লোভ ও সেই শহরের ইতিহাস মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ভ.গ. ইজভিয়েকভ। ওপরে যাঁদের কথা লিখেছি, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি নানাভাবে কৃতজ্ঞ।

অর্চন সরকার

মহামহিম

প্রতাপশালী

মহান রাজাধিরাজ

সম্রাট

আলেকজান্দার পাভলোভিচ সমীপেষু,

সমগ্র রাশিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি

ইতি আদি।

সর্বদয়াবান রাজাধিরাজকে

সমগ্র আনুগত্যের সহিত নিবেদিত

মহামান্য সম্রাট

মান্যবরেষু

পিটার দ্য গ্রেটের হৃদয়ে মহান মোগল সম্রাটের সহিত অন্তরঙ্গতার কল্পনা তদাবধি জাগ্রত ছিল—যাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় বিগত ১৭১৬ সালে আলেকজান্ডার বেক্কেভিচ চেরকাস্কির (যিনি কারিগরদিগের সাধারণতম পোশাক পরিধানে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না) নেতৃত্বে প্রেরিত বিখ্যাত তাতার অভিযান হইতে, তেমনি ১৭২৩ সালে সেই মহামতি সম্রাটেরই ভাইস অ্যাডমিরাল ভিলস্তের মারফত তৎকালীন ভারত সম্রাটের নিকট প্রেরিত মানপত্র হইতে, এমনকি সেই একই ব্যাপার লক্ষিত হয় ফরাসি যাজক বিনোনের পত্র হইতে, যাহার উপর মহামান্য সম্রাটের নির্দেশে কালমিকি ও মোঙ্গল ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল।

রুশ সাম্রাজ্যের বিচক্ষণ প্রতিষ্ঠাতার গৌরবজনক কীর্তিকলাপে ঈর্ষাপরায়ণা হইয়া দ্বিতীয় ইয়েকাতেরিনা একই উদ্দেশ্যসাধনে কোনও পদক্ষেপ লইতেই বাকি রাখেন নাই।

মহামতি সদাশয় পিতৃসম সম্রাট আপনার অনুগ্রহলাভ অবশ্যই অনুগত প্রজার পক্ষে শ্লাঘনীয় ও সুখদায়ক স্মৃতি, জনহিতকর তথ্য সন্ধানে আমার প্রচেষ্টাকে অনুমোদন দান করিয়া, পরমকরুণাময় সহজাত নিজ মহিমায় পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে পূর্ব ভারত পর্যন্ত পৌঁছাইবার নির্দেশাবলি দিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, যেই স্থানে, স্বদেশের প্রয়োজনে এই বইতে লিপিবদ্ধ বিষয়গুলির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ বারো বৎসর সময়কাল আমি নিজের জীবন ও ভরণপোষণের ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করিয়া ব্যয় করিয়াছি।

যদিও আমি আমার স্বদেশপ্রেমের সকল অনুভূতির ফসল সংগ্রহ করিয়া পরমকরুণাময় আমার শুভাকাঙ্ক্ষীকে আনিয়া দিতে সক্ষম হই নাই, তথাপি নিজেকে কম সুখী মনে করি না, এই কারণে যে, পূর্বপুরুষদিগের গৌরবে
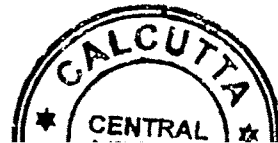
আগ্রহী আপনার অন্তরে নিহিত প্রতিযোগিতার মনোভাব, সর্বসাধারণের মঙ্গলকামনায় জ্ঞানীর মনোভাব, আমাকে ও আমার কাজকে আপনার উচ্চ রাজকীয় মনোযোগ আকর্ষণের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

মহামান্য সম্রাট! স্বদেশের স্নেহবৎসল পিতা। এইরূপ সাফল্যের মাঝে আমার সকল মানসিক অনুভূতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত, আপনার প্রাপ্য সম্মান আপনাকে প্রদর্শন করিয়া, একান্ত অনুগত রূপে নিজেকে নত করিতেছি ও আমার যথাসাধ্য শ্রমের ফসলটি আপনার, মহামান্য সম্রাটের, পবিত্র চরণতলে নিবেদন করিতেছি, বিফল যাইবে না আশা করিয়া যে, আপনার উচ্চ রাজকীয় দৃষ্টি এই প্রকার ত্যাগ স্বীকার যদিও অতিসামান্য, কিন্তু তাহা আমার অন্তরের গভীর হইতে নিখাদ অধ্যবসায়ের সহিত কৃত, যাহা কেবলমাত্র আমার স্বদেশবাসীরই নহে বরং বিভিন্নদেশি মানুষেরও নজরে পড়িবে ও হইতে পারে নিরলস কতিপয় গবেষকদিগের জন্য বহু শতাব্দীব্যাপী অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া থাকা প্রাচীন যুগ সম্পর্কিত গবেষণার কাজে পথনির্দেশিকা হইবে, যেইরূপ ধর্মীয় সেইরূপই রাজনৈতিক জীবনযাত্রার যুগবর্ণনায়, যেইগুলির আবিষ্কার, মঙ্গলচিন্তাকারী বিজ্ঞানীদিগের সকলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, পৃথিবীব্যাপী ছড়াইয়া থাকা মনুষ্যজাতির মিলন ঘটাইয়া থাকে, সমগ্র বিশ্বে ঈশ্বরোপলব্ধি, ধর্মবিশ্বাস ও অনুশাসন সম্পর্কে যথার্থ ধারণার প্রসার করিয়া থাকে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে কাম্য মৈত্রীয় পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় হইয়া থাকে ও সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন কল্যাণকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কাজে সকল গুণাবলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া থাকে।

পরমকরুণাময় সম্রাট!

মহামতি সম্রাটের একান্ত অনুগত

গেরাসিম লেবেদেভ।

---

* এখানে আলেকজান্ডর বেক্কেভিচ চেরকাস্কির দ্বিতীয় অভিযানের কথা বলা হয়েছে। প্রথম পিটার চেরকাস্কিকে খিবিনের খানের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন তিনি যেন খানকে জলযান দিতে অনুরোধ করেন ও তাতে এ. কোজিন নামক নাবিকের ছদ্মবেশে আমুরিয়া নদী দিয়ে যতদুর যাওয়া যায় ততদূর গিয়ে তারপর ভারতের দিকে যাত্রা করেন, এর জন্য বিশেষ নির্দেশাবলি তৈরি করা হয় ও মোগলকে মানপত্র দেওয়া হয়েছিল // সলভিয়েভ স. ম. রচনাবলি। মস্কো, ১৯৯৩, ৯ নং গ্রন্থ, ১৮ নং খণ্ড। পৃঃ ৩৪১-৩৪৩।

** ১৭২৩ সালে প্রথম পিটার ভারতে দুটো জাহাজ পাঠিয়েছিলেন; ক্যাপ্টেনদেব নির্দেশাবলিতে লেখা ছিল: ঈশ্বরের কৃপায় ইস্ট ইন্ডিয়ায় যখন পৌঁছোবে তখন মহান মোগল সম্রাটের সামনে উপস্থিত হয়ে যেভাবেই হোক তাঁকে রাজি করাবে যাতে সে রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করার অনুমতি দেয় ও যাতে রাশিয়ায় যেসব জিনিসের প্রয়োজন ও তাঁর অঞ্চলে রাশিয়ার যেসব জিনিসের প্রয়োজন, সে ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে চুক্তি হয়, এবং এমনভাবে কাজ করতে যাতে দুপক্ষেরই লাভজনক ব্যবসা করা সম্ভব হয়।

*** প্রথম পিটার অন্য পথে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা দেখেছিলেন মঙ্গোলিয়া ও চিনের মধ্যে দিয়ে। মঙ্গোলীয় ভাষায় (গে.স. লেবেদেভের কালমুকি ভাষায় করা অনুলিপি) লেখা সাহিত্যের অনুবাদ করার কাজ সম্রাটের বিনোনকে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে রুশিরা ৎসিন সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী মঙ্গোলদের ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

মুখবন্ধ

পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি, তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও লোকাচার সম্পর্কে জানিবার উদ্যোগ যতোধিক গুরুত্বপূর্ণ ততোধিকই কঠিন।

গুরুত্বপূর্ণ, যেইহেতু পূর্ব ভারত, উহার প্রাচুর্য ও গুপ্তধন যাহার দিকে কেবলমাত্র ইউরোপই নহে, সম্ভবত সমগ্র বিশ্ব ঈর্ষার চক্ষে দেখে, তাহা ছাড়াও ইহা হইতেছে পৃথিবীর মুখ্য স্থান যাহা হইতে, বিভিন্ন জীবন আলেখ্যকারের সাক্ষ্য অনুযায়ী, মানবজাতি পৃথিবীর বুকে পৃথক পৃথক বসতি স্থাপন করিয়াছিল ও জাতীয় ভাষা সংস্কৃত, যেটির সহিত কেবলমাত্র বহু এশীয় ভাষাই নহে, পরন্তু ইউরোপীয় ভাষাগুলিরও নিয়মাবলিতে যথেষ্ট মিল প্রত্যক্ষ করা যায়।

এই তর্কাতীত সত্যকে, অন্যান্য বহু ঐতিহাসিক ছাড়াও, যথেষ্ট স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন লোমোনোসোভ, পাল্লাস* এবং আলেক্সই আগাফোনোভ**, যাঁহাদিগের মধ্যে প্রথমজন রুশ জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "**সারমত, আমাজন, ভারিয়াগ, রস বা রসোলান** ও অন্যান্য বিভিন্ন স্লাভ জাতির পূর্বপুরুষগণের উৎপত্তি এশিয়াতেই এবং তাহারা বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী একই জাতি।" ভারতীয় ভাষায় এই নামগুলিই উচ্চারিত হইয়া থাকে **স্বর-মাতা (স্বর্গবাসী), আমারখনি (আমার অর্জন বা অর্জিত সম্পদ?), বারা-গেহ** অথবা **বার-গেই (প্রাচ্য জাতি, বরগি?), রস নামি** অথবা **রসল নামি (আলোকের পুত্রগণ)**। দ্বিতীয়জন তাঁহার ভ্রমণ সংক্রান্ত গ্রন্থে মানচুরিয়ান বা চিনের দেবতাদিগের সহিত ভারতীয় দেবতাদিগের চিত্রের বহু মিল দেখাইয়াছেন। তৃতীয়জন মানচুরিয়ান ও চিনে ভাষা হইতে রুশ ভাষায় তাহার অনূদিত সুন-জি হানের আইনের গ্রন্থটিতে বহু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দেখাইয়াছেন।

এই কাজটি কঠিন কারণ বিভিন্ন সময়ে কৌতূহলী গবেষকদিগের সকল প্রয়াস সত্ত্বেও, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি সম্পর্কেই নহে, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সঠিক তথ্য তৎকালে ইউরোপে ছিল না, এমনকি ভারতবর্ষেও কাহারও নিকট হইতে ওই বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হইবার উপায় ছিল না, ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা সেই স্থানে আগত ইউরোপীয়দিগকে দেখিতেন অমানবিক নিপীড়ক বা ঘৃণ্যতম অচ্ছুতের ন্যায়, যাহাদিগকে ভারতীয়গণ গৃহ সংলগ্ন উঠান হইতে সমস্ত অপবিত্র জিনিস সরাইবার ও বহন করিয়া লইয়া যাইবার কাজে ব্যবহার করিতেন।

আমার পক্ষে এই উদ্যোগ অধিক কঠিন হইয়াছিল, এই কারণে যে, যাত্রার পূর্ব অবধি আমার নিকট নিজ

দেশের জাতীয় ভাষার যথেষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল না, যদিও ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণের ফলে আমার শিষ্টাচার শিক্ষা সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু আমার অভিভাবকদিগের সীমিত ক্ষমতার ফলে ১৭৪৯ সালে আমার জন্মের পনেরো বছর পর কোনওক্রমে কেবলমাত্র তৎকালীন সময়ের লেখাপড়ায় বা শিক্ষায় এবং ঘটনাক্রমে সঙ্গীতশিল্পে আমি শিক্ষিত হইতে পারিয়াছিলাম।

এই সকল সত্ত্বেও একদিকে পৃথিবী দেখিবার উদ্দীপিত বাসনা, আমার সহজাত প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধন ও আমার নিজের ও স্বদেশবাসীর স্বার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান এবং অপর দিকে স্পষ্টত ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী বিধাতার লীলায় মানুষের পক্ষে যাহা অসম্ভব তাহা সম্ভবপর হইয়াছে।

১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে নেপোলি যাত্রাকালে, দূতাবাস আমার ভ্রমণের ইচ্ছা পূরণ হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিল কিন্তু নেপোলি প্রেরিত দূত যাহার সহিত আমি রাশিয়া হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, ভিয়েনার সহিত প্রুশিয়ার যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যকলাপ হেতু, সে এক বৎসরের অধিককাল ভিয়েনায় রহিয়া গেল, তখন আমি ভিয়েনা হইতে নিজ যাত্রা নিজ খরচায় অব্যাহত রাখিবার সিদ্ধান্ত লইলাম, এই আশা করিয়া যে, আমার সঙ্গীতশিল্প আমার সঙ্গীত শিক্ষা আমার গ্রাসাচ্ছদনের খবর জুটাইতে পারিবে। ভিয়েনা দরবারের রুশ রাষ্ট্রদূত গালিতসিন ও নেপোলিতে একই পদে মনোনীত কাউন্ট রাজুমভস্কি যথেষ্ট সদয় হইয়া সুপারিশপত্রের দ্বারা সমর্থন করিলেন আমার এই সাহসী ও উদ্যোগী পরিকল্পনাকে; উহাদিগের মাধ্যমে ইউরোপের বহু রাজদরবারে আমার সুযোগ হইয়াছিল প্রভূত ক্ষমতাশালী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের অনুগ্রহলাভে সম্মানিত হইবার।

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্যারিস আগমণমাত্র তৎকালীন উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন পর্যটক কাউন্ট ও কাউন্টেস সেভেরনি*** নামে পরিচিত চিরস্মরণীয় সম্রাট পাভেল পেত্রভিচ ও অদ্যাবধি সুস্থ শরীরে বর্তমানা সম্রাজ্ঞী মারিয়া ফিওদোরভনার নিকট আমাকে পরিচয় করাইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

তাঁহাদিগের দীপ্তিচ্ছটা কেবলমাত্র প্যারিস ও মন্তপেলিয়ার নিকট অবস্থিত এতুপে থাকাকালীন সময়ে আমাকে মোহিত করিয়া রাখিল তাহা নহে, উচ্চ রাজকীয় দাক্ষিণ্য আমাকে সঙ্গ দিয়াছিল এমনকি প্রাচ্য পর্যন্ত, কারণ ইংল্যান্ড হইতে ভারত যাত্রার পথেও ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাষ্ট মাদ্রাজ শহরে যেই স্থানে রদনের নামক জাহাজ পৌঁছাইবামাত্র, যেটি করিয়া অন্যান্যদিগের সহিত আমি পাড়ি দিয়াছিলাম, নোঙর ফেলিবার পর তৎক্ষনাৎ সেই স্থানের নগরপাল ইতোমধ্যে লিখিত নিমন্ত্রণপত্র নৌকায় প্রেরিত বাহকের মাধ্যমে পাঠাইয়া দিলেন আমাকে সেই শহরে আমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে, যেই স্থানে পৌঁছাইবার পর আমার থাকিবার জায়গা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ও সেই স্থানে দুই বৎসর আমার সঙ্গীতশিল্পের দৌলতে আমার জীবিকার্জনের বিশেষ সংস্থান হইয়াছিল।

সেই স্থানে বসবাসকারী ইউরোপীয়দিগের সহায়তায় যথেষ্ট সচ্ছল অবস্থায় পৌঁছাইবার পর আমি কিঞ্চিৎ মালাবার জাতির ভাষা শিখি, কিন্তু মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ্যবিদ্যা বোধগম্য হইবার উপায় আমি নির্ধারণ করিতে পারিতেছিলাম না, কারণ ওইগুলির মূল সাহিত্য লিখিত দেবভাষায়, যাহা সেই স্থানের ভারতীয়দিগের মধ্যে কেহই ইংরেজি ভাষায় আমাকে ব্যাখ্যা করিয়া দিবার অবস্থায় ছিলেন না।

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে আমি চলিয়া আসি কলিকাতায়, যেই স্থানে আমার সঙ্গীত আরও অধিক সংখ্যক সঙ্গীত অনুরাগীর মনোযোগ কাড়িয়াছিল এবং যেইহেতু সেই স্থানে উহা আমাকে পৌঁছাইয়া দেয় বহুগুণ অধিক লাভজনক অবস্থায়, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞরূপে এই গ্রন্থে প্রদত্ত বিষয়গুলি বুঝিবার নিমিত্ত উহার অভ্যন্তরে

প্রবেশ করিতে শুরু করি এবং আমার শিক্ষকদিগের সহায়তায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া দুইটি নাটক ইংরেজি হইতে বাংলায় অনুবাদ করিতে সক্ষম হই, যেগুলির মধ্যে একটি নাটক ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে আমার নির্দেশনায় বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রীদিগকে দিয়া দুইবার মঞ্চস্থ ও যাহার দ্বারা ইউরোপীয় ও এশীয় দর্শকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল আমার নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত প্রেক্ষাগৃহে, যাহা আমার পূর্বে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহই কলিকাতায় করেন নাই।

সম্মানিত এবং শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদিগের অধীনে আমি প্রণিধান করি ব্রাহ্মণ্য বর্ণমালা, শব্দকোষ, ব্যাকরণ, পাটিগণিত, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি বিষয়গুলি যেইগুলি সংক্ষিপ্তাকারে এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে এবং আমি যেইরূপ তাঁহাদিগকে ন্যায্য মর্যাদা দিয়াছিলাম তাঁহাদিগের জ্ঞানের ক্ষেত্রে, সেইরূপ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহাদিগের নিকট হইতে তথ্য পাইয়াছিলাম সংস্কৃত ভাষা নামান্তরে **দেবনাকব** (দেবনাগরী) বা প্রাকৃত সম্পর্কে, যাহা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বাংলা বা ওড়িয়া ভাষা এবং **মরিশ বা মুর্স** নামক সেই সর্বজনীন উপভাষা যাহা কেবলমাত্র সমগ্র ভারতবর্ষেই নহে এমনকি সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া থাকা যাযাবর জাতির দ্বারা ব্যবহৃত হয় যাহারা ভারতীয় প্রজাতি হইতে উদ্ভূত। আমি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি, তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও লোকাচার সংক্রান্ত ধারণা গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং অবশেষে আবিষ্কার করিলাম যে, প্রকৃত ভারতীয়গণ, আপাতদৃষ্টিতে, ইউরোপীয়দিগের ন্যায়ই ঈশ্বরকে জানিবার পন্থা দিয়াই তাঁহাদিগের শিক্ষা শুরু করিয়া থাকেন, একমাত্র পার্থক্য ইহাই যে, সহজাত প্রবৃত্তি অপেক্ষা ধর্মীয় অনুশাসনকে বা স্বাভাবিক বিষয়গুলির ব্যাখ্যাকে বেশি প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

গোঁড়াদিগের ন্যায় তাঁহারাও, এক পরম ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাকেন, যাহার নাম তাঁহারা দিয়াছেন ব্রহ্মা, যিনি স্বর্গ, মর্ত ও সকল প্রকার দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জীবের স্রষ্টা।

তাঁহার অবিমিশ্র ও একই মৌলিক স্বভাববিশিষ্ট ত্রিত্বকেও স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ভাষায় যাহার নাম **ত্রোইকো**, এবং ঈশ্বরের পুত্রের মনুষ্যরূপ ধারণ, যিনি তাঁহাদিগের দ্বারা কৃষ্ণ নামে অভিহিত, অথবা তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকেন যে, নভোমণ্ডলে কোন এক বিশৃঙ্খলার কারণে যাহার পর ঈশ্বরের পুত্র প্রেরিত হইয়াছিলেন মর্তে এবং রক্তমাংসের মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া পাইয়াছিলেন তাঁহার পবিত্র কুমারী মাতা ও স্তনদাত্রী চশো (যশোদা)-কে, যাঁহার নামের অর্থ আলোকদায়ী, যিনি, সম্ভবত এই কারণেই তাঁহাদিগের দ্বারা দুর্গা নামেও অভিহিত হইয়াছেন, যাহা এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে উৎসব বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায় দেখানো হইবে।

এই সকল ব্যতীত, তাঁহারা স্বীকার করেন এক ঐশ্বরিক সত্তাকে, সমগ্র বিশ্ব রূপে যাহা **সত্য যুগ** নামে মূর্ত, অর্থাৎ পবিত্র সত্তা অথবা প্রাচীন দার্শনিকদিগের মতে বিশ্ব আত্মা, সর্বধারণকারীর নির্দেশানুযায়ী যাহা যুগান্তে পরিবর্তনশীল বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে।

তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও নিয়মকানুন রহিয়াছে যাহার নাম ধর্ম বা **দেকা লোক** (Decalogue) বা **পেরেস্তা** (ফোরেস্তা) এবং পাঁচটি বিভিন্ন প্রলেপন অনুষ্ঠান ও মন্দির, যেই স্থানে তাঁহারা তাঁহাদিগের ভগবজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

কিন্তু কোথা হইতে তাঁহার এই ভগবজ্ঞানের আলো আহরণ করিলেন? কোথা হইতে তাঁহারা এই সকল গূঢ় বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন?

গির্জার খ্রিস্টান জীবন লিপিকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই ভগবজ্ঞানের আলো ভারতীয়গণ পাইয়াছিলেন গসপেলের বাণী হইতে, যাহা তাঁহাদিগের নিকট পৌছাইয়াছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচারক ফোমা (Thomas) -র মারফত্, যাঁহার কবর অদ্যাবধি রহিয়াছে মালাবার উপকূলে, যাহা মাদ্রাজ হইতে আট মাইল দূরে সানটমাস নামক এক উঁচু পাহাড়ের উপর সমুদ্রের দিকে মুখ করা জেসুইট মন্দিরে, যেই স্থানে প্রতি বৎসর সেন্ট টমাসের দিনে বড় সর্বজনীন উৎসব পালিত হইয়া থাকে।

কিন্তু ভারতীয়গণ তাঁহাদিগের ধারণায় অটল যে, তাঁহাদিগের সকল জ্ঞান পরম্পরা মানিয়া আদি মানব মারফত স্বয়ং জাগতিক জীবের স্রষ্টার নিকট হইতে তাঁহার লাভ করিয়াছেন, যাহা বহু বৎসর ধরিয়া সকল প্রজন্মের মাধ্যমে প্রচারিত, যেইরূপ চিনদেশীয়গণ তাহাদিগের উৎপত্তিকাল বহু প্রাচীন, আমাদিগের ধারণার অতীত সময়ে বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

তাঁহাদিগের এই সকল জ্ঞান বিস্তারে সহায়ক লিপিগুলি নিম্নরূপ:

১) সংস্কৃত বা প্রাকৃত নামান্তরে **দেব নাকব** (দেবনাগরী) অর্থাৎ ঈশ্বর-অঙ্কিত বর্ণমালা;

২) শব্দকোষ বা অক্ষর, যাহাতে সমস্ত জীবের নাম বর্ণনা রহিয়াছে;

৩) পাটিগণিত, যাহাকে নাম মাতা বা সংক্ষেপে নামতা বলা হয়;

৪) ভারতীয়দিগের বেদান্ত।

এইগুলিই হইতেছে পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মুখ্য উৎস, যেইগুলির উপর তাঁহাদিগের বিশ্বাস অনড়।

এইগুলিই বারো বৎসর কলিকাতায় থাকাকালীন সময়ে আমার সেই সংগৃহীত তথ্য, যেইগুলির দ্বারা আমি আশা করি প্রকৃত জ্ঞানানুরাগী ও বিভিন্ন বিষয়ের নিরপেক্ষ গবেষকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব।

যেইরূপ আমার ভ্রমণের শুরুতে, সেইরূপই ভ্রমণ চলাকালীন সময়ে আমার কাজের মূল লক্ষ্য হিসাবে আমি স্থির করিয়াছিলাম আমার সহজাত প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধন, যাহা করিবার নিমিত্ত অমর স্মৃতিধন্য সম্রাটের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলাম, সেইহেতু এই গ্রন্থটির নামকরণ করিলাম **পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণদিগের রীতিনীতি, তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও লোকাচার সংক্রান্ত নিরপেক্ষ পর্যেষণা।**

এই গ্রন্থটিতে তিনটি ভাগ: প্রথম দুইটিতে রহিয়াছে ভারতীয়দিগের দ্বারা নিরূপিত চারিটি যুগ সংক্রান্ত সূচনাগতভাবে ভিন্ন দুইটি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতি, যেগুলির মধ্যে প্রথম ভাগটিতে রহিয়াছে ব্রাহ্মণ বগাস্বতী (ভাস্বতী? ভাস্কর?) কর্তৃক প্রকাশিত প্রারম্ভিক চন্দ্র পদ্ধতি এবং ইহাতে অন্তর্ভুক্ত সত্য যুগ নামক প্রথম শুদ্ধ যুগ—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে শুরু করিয়া এই পৃথিবীতে সূর্য দৃষ্টিগোচর হইবা অবধি যাহার ব্যাপ্তি। এই যুগ, অর্থাৎ আলোকরূপে সত্তার/আত্মার প্রকাশ, ইহার বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক শুদ্ধতায় এবং মানুষের আদিমকালীন জীবন ভারতীয়দিগের দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে হালকা সবুজ বা সাদা রঙের **পুষ্প বা সফেত** (সফেদ) রং দ্বারা।

দ্বিতীয় খণ্ডে রহিয়াছে ব্রাহ্মণ **সূর্চ দয** (সূর্যোদয়?) কর্তৃক প্রকাশিত প্রারম্ভিক সৌরীয় পদ্ধতি, এই পৃথিবীতে সূর্যের প্রকাশ হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী তিনটি যুগ ধরিয়া, যেইগুলির মধ্যে সৌর পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথম ও চান্দ্র পদ্ধতি অনুযায়ী দ্বিতীয় যুগ দ্বাপর যুগ। এই যুগের বৈশিষ্ট্য অন্তরিক্ষে সৃষ্ট সত্তাগুলির বিদ্রোহ, যাহার কারণে এই যুগ তাঁহাদিগের দ্বারা কালো রঙের পুষ্প বা কালো রঙে চিত্রিত হইয়াছে।

সৌর পদ্ধতি অনুযায়ী দ্বিতীয় ও চান্দ্র পদ্ধতি অনুযায়ী তৃতীয় যুগের নাম হইল ত্রেতা যুগ। সূর্যের দ্বারা পৃথিবীর উৎকর্ষসাধন এই যুগের বৈশিষ্ট্য বলিয়া তাঁহারা সোনালি রঙের ওর পুষ্প বা ওনর (স্বর্ণ) রঙে চিত্রিত করিয়া থাকেন।

সৌর পদ্ধতি অনুযায়ী তৃতীয় ও চন্দ্র পদ্ধতি অনুযায়ী চতুর্থ যুগের নাম **চোত্তরতয** বা কলি যুগ, যেটি বর্তমানে চলিতেছে। এই যুগের বৈশিষ্ট্য মিথ্যা ও ভ্রষ্টাচারপূর্ণ মানুষের জীবনযাপন বলিয়া চিত্রিত হইয়া থাকে হলুদ রঙের **চরদ পুষ্পে** বা **চরদ** রঙে।

এই যুগগুলিকে ভারতীয়গণ বুঝিয়া থাকেন কেবল এক একটি শতাব্দী হিসাবে নহে, যেইরূপ সাধারণভাবে ইউরোপীয়গণ বুঝিয়া থাকে, বরং বুঝিয়া থাকেন সময়ের ধারাবাহিকতা রূপে, যুগগুলির প্রতিটি ৩৪০০ বৎসর লইয়া গঠিত এবং এইগুলিই সেই চারিটি যুগ, যেইগুলির দ্বারা ভারতীয়গণ সমগ্র পৃথিবীর সাময়িক অস্তিত্বের সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যেইগুলির সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে খ্রিস্টানদিগের ন্যায় তাঁহারাও ধ্বংসের অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

তৃতীয় ভাগটিতে রহিয়াছে ব্রাহ্মণদিগের পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ভারতীয় লোকাচার।

এইরূপে সৌহার্দ্যপূর্ণ স্বদেশকে আমার এই সকল কষ্টার্জিত জ্ঞান অবগত করাইয়া, পাঠকবর্গকে জানাইবার প্রয়োজন বলিয়া মনে করি যে, এই গ্রন্থের সকল ভারতীয় শব্দ আমি লিখিয়াছি ইউরোপীয় মতে নহে বরং ভারতীয় উচ্চারণ অনুসারে, যাহার অবহেলন হেতু বহু ইউরোপীয় প্রকাশনায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্যের মূল ভাষায় প্রকৃত অর্থ এইরূপ হারাইয়া গিয়াছে যে, ওই গুলির নিজস্ব তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইতে বহু কষ্টের প্রয়োজন।

সম্ভবত, ভারতীয় হিন্দুদিগের পদ্ধতি ও রীতিনীতির খুঁটিনাটির ব্যাপারে অতি যত্নশীল গবেষকগণ আমার কর্মেও ত্রুটিবিচ্যুতি খুঁজিয়া পাইবেন, যেইরূপ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি আমার পূর্বসূরিদিগের কর্মে, এই কারণেই আশা রাখিতেছি আমাকেও ক্ষমা করা হইবে এবং সেইগুলি স্বদেশের স্বার্থে নির্দিষ্ট গন্তব্যহীন ভ্রমণকারীর ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইবে না।

ভবিষ্যতে বহুবিধ সমস্যা ও ত্রুটির পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকে এড়াইবার নিমিত্ত এই ধরনের উদ্যোগে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রস্তাব করা আমার কর্তব্য বলিয়া গণ্য করি, যেন তাঁহারা এই কর্ম শুরু করেন প্রথমে নিজদিগের জ্ঞান ত্রুটিহীনভাবে উপলব্ধি করিয়া এবং সেই স্থানের জ্ঞানের সহিত ঐক্য মতে আসিবার নিমিত্ত অন্ততপক্ষে সেইগুলির মুখ্য ভিত্তি বা গ্রন্থগুলি নিজদিগের নিকট মজুত রাখেন, যেইরূপ স্লাভনিক রুশ বর্ণমালা, যেটির বহুল মিল ও নৈকট্য রহিয়াছে বহু সংখ্যক ভারতীয় বর্ণমালার সহিত, শব্দকোষ, ব্যাকরণ, ভূগোল, প্রাকৃতিক ইতিহাস, দর্শন, বাইবেল, এমনকি পৌরাণিক কাহিনি, এই সকলের বিশেষ নির্দেশাবলি ও ইহা ব্যতীত সরকারি বিশেষ সুযোগসুবিধাগুলি যেন তাহাদিগের থাকে, এবং ওই স্থানে পৌঁছাইয়া ওই স্থানের জনগণের রীতিনীতি ও শিষ্টাচার মান্য করিয়া চলেন বর্ণগুলির লুক্কায়িত অর্থ ও প্রাচীন ভারতীয় কিংবদন্তির সংক্ষিপ্ত শব্দগুলির সঠিক অর্থ বাহির করিবার জন্য, যেন তাঁহারা **দেব নাকর** বা প্রাকৃত নামক সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত থাকেন।

সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতিসাধনে সহায়তা করিয়া, ভারতীয় ব্যবসায়ী কোম্পানির উপকার করিবার আশায় আমি

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে আমার ব্যক্তিগত ভাষ্যে ও অর্থানুকূল্যে প্রকাশ করি ভারতীয় মিশ্র ভাষার একটি সঙ্কলন ও কথ্য ভাষার ব্যাকরণ, যেইরূপ তদবধি ইউরোপে ছিল না, যাহা দিয়া তাঁহাদিগের উপভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত সকল নিরপেক্ষ গবেষকগণ আমার কাজের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করিতে পারিবেন।

লন্ডনে এইরূপ গ্রন্থের প্রকাশনায় যদিও অনুপ্রাণিত আমি নিজের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া যারপরনাই আত্মশ্লাঘা বোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্বদেশে আমার সম্রাটের উদারতায়, অন্য একটি ঘটনায় সুখী হইবার সুযোগ হইয়াছিল, যখন সেই সংস্করণটিই আমি স্বহস্তে তুলিয়া দিতে পারিয়াছিলাম মহান সম্রাটের হস্তে এবং সংস্করণটি তাঁহার প্রভূত সংবর্ধনা ও পরম দয়াশীলের সুখ্যাতি পাইয়াছিল।

যদি বিধাতার ইচ্ছায় আমার জীবন দীর্ঘায়িত হয় ও দূর হয় সেই ধরনের সমস্যা, যেইগুলি প্রকাশনাকালে আমার সহিত চিত্রশিল্পীদিগের হইয়াছিল, অনুগত প্রজা হিসাবে কেবলমাত্র উপরোক্ত মিশ্র উপভাষায় গ্রন্থটিই নহে, এমনকি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ, শব্দকোষ ও পাটিগণিত এবং উপরিউল্লিখিত নাটকগুলি আমাদিগের নিজস্ব রুশ ও ভারতীয় ভাষাগুলিতে প্রকাশ করা আমার কর্তব্য বলিয়া গণ্য করি।

---

* পাল্লাস প.স. (১৭৪১-১৮১১) পিটার্সবার্গের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য (১৭৬১), বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সাইবেরিয়া, ভোলগা তীরবর্তী ও রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্ল্যানমাফিক বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণকারী। তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ —"তিন, মঙ্গোলিয়া, কিরগিজস্তান, বাস্কিরস্তান ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশের মানুষের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত তথ্যবহুল ভ্রমণকালীন দিনলিপি।" ১৭৭১-১৭৭৬ সালে রচনাটি "রুশ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ" নামে তিন খণ্ডে সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে প্রকাশিত হয়।

** **আগাপোনভ আ.স.**, চাইনিজ ভাষায় লিখিত "মানচুরিয়ান ও চৈনিক সুন-জি খানের পরিচালনার ক্ষেত্রে উপকারী ও প্রয়োজনীয় চিন্তা বা কার্যধারা" বইটি রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন, সেটি ১৭৮৮ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে প্রকাশিত হয়।

*** **কাউন্ট সেভেরনি ও কাউন্টেস সেভেরনায়া** ছদ্মনামে হবু সম্রাট পাভেল পেত্রভিচ ও সম্রাজ্ঞী মারিয়া ফিওদোরভনা ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তাঁদের প্যারিস থাকাকালীন সময়ে লেবেদেভকে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, লেবেদেভ সাক্ষাৎকালে রুশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে নিজের ভারত দর্শনের অভিপ্রায়ের কথা জানান ও ভ্রমণ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে তাঁদের সমর্থন লাভ করেন।

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ

সাতটি অধ্যায় লইয়া গঠিত, যথা:

দ্বিতীয় ভাগ

পাঁচটি অধ্যায় লইয়া গঠিত, যথা:

তৃতীয় ভাগ

সাতটি অধ্যায় লইয়া গঠিত, যথা:

প্রথম চান্দ্র যুগে উদ্ঘাটিত তথ্যভিত্তিক, সংস্কৃত ভাষায়
"সোমা রিত অন্দ" (সোমাত্ আহ্বতম অন্নম্) নামক
ব্রাহ্মণ্যবিদ্যার উৎসগুলি সম্পর্কে

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বিষয়ক

ভারতীয়গণ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় তাঁহাদিগের ঘটনাপঞ্জির কালানুক্রমিক গ্রন্থনা শুরু করিয়াছেন পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে এবং প্রথম যুগ হিসাবে তাঁহাদিগের নিকট পরিগণিত হয় চান্দ্র যুগ, যেটি যেইরূপ কল্প অথবা সৃষ্টি ও লয়ের সময়, তদ্রূপ মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থারও কাল, তাঁহাদিগের মতে যুগটি আলোকিত হইত চন্দ্র দ্বারা, সূর্য দ্বারা নহে এবং অব্যাহত ছিল ৩৪২০ বৎসর।

তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকেন যে, আদি, স্বয়ংশাসনক্ষম, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ব্রহ্মা তাঁহার সম্পূর্ণ প্রাজ্ঞতা বা জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি ও লয় মিলাইয়া এক কল্প দিনের সূচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিনটির হিসাব তাঁহারা করিয়া থাকেন বৃহস্পতির চক্রাকার ঘূর্ণন অনুযায়ী, যাহা সম্পূর্ণ হয় ৪৩২০ দিনে বা ১২ বৎসরে।

উপরোক্ত কল্প হইতে সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা এই পৃথিবীকে **সর্বাঙ্ক**, **রূপ অথবা বোদন** নামক দর্শনযোগ্য আকার প্রদান করেন, তথায় তাঁহার সর্বপ্রকার সৃষ্টির প্রারম্ভিক ভিত্তি প্রস্তাব করেন, বস্তুনিচয় বিন্যস্ত করেন, প্রতিটি জীবের জন্য বিশিষ্ট সীমারেখাও নির্দিষ্ট করিয়া দেন, সাধারণ অবস্থায় সহযোগী সর্বপ্রকার শক্তিকে সংযুক্ত করেন, সমস্ত প্রকার পারস্পরিক নির্ভরশীল জীবের কাজে সম্মতি দান করেন এবং প্রত্যেক সৃষ্ট জীবকে উহার বিশেষ শারীরিক গঠন অনুযায়ী অনুভূত হইতে দেন স্বীয় অস্তিত্ব, **ৰগাবিনী** (ভবানী) নামান্তরে ভৈরবী, মা, **সবগাব** অথবা **কাশেত** নামক ব্রহ্মাণ্ডের ফলদায়ী বৈশিষ্ট্যকে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার উপকরণে সমৃদ্ধ করেন। সমগ্র পৃথিবীর গঠনব্যবস্থায়, একযোগে ক্রিয়াশীল উপাদানগুলির মধ্যে পৃথিবীর চারিপ্রান্তে ভারসাম্য ও বিরামহীন উৎপাদনে ভিন্নতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত প্রকৃতি ও নৈতিকতার একত্রীকরণে সাধারণ নিয়মের সূত্রপাত করিয়া, **রাকগা** (রাগ) নামক ৬ জন আধ্যাত্মিক পুরুষ ও **রাকগিনী** (রাগিণী) নামক ৩৬ জন আধ্যাত্মিক নারীকে বৎসরের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তনে, উপাদান সংক্রান্ত উৎপাদন ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন।

সমস্ত কিছু সম্পন্ন হইবার পর সর্বজ্ঞানী ব্রহ্মা এই পৃথিবীকে আকার দ্বারা ভূষিত করেন সমস্ত প্রকার জীবের বৈশিষ্ট্য হইতে সত্য যুগ নামক ঐশ্বরিক সত্তা সৃষ্টির নমুনা হিসাবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁহার যুগটির স্থায়িত্ব নির্ণয়ের ইচ্ছা হয়, ইহাকে পৃথিবীর আকৃতি দ্বারা ভূষিত করিয়া ও ফলদায়ী বৈশিষ্ট্যকে সঞ্জীবিত করিয়া মহাবিশ্বের সামগ্রিক সত্তাকে কল্প অর্থাৎ সৃষ্টি ও লয়ে রূপান্তরিত করেন। চন্দ্রকলা ও তারা, নামান্তরে **পারার প্রেক** (?)

অর্থাৎ **পেরেকের ন্যায় আকাশের উচ্চতা ধরিয়া রাখা** (?), অন্ধকারকে আলোক হইতে পৃথক করেন এবং সৃষ্ট সকল কিছুর উপর মহিষাসুর নামক এক ঐশ্বরিক সত্তাকে প্রহরায় স্থাপন করিয়া পৃথিবীতে সমস্ত প্রকার অস্তিত্বের সমন্বয়ে প্রথম গতি সঞ্চার করেন।

এই সময় হইতেই প্রথম শুদ্ধ যুগ শুরু হইয়াছিল, এবং ঐশ্বরিক সত্তা সত্য যুগ, পৃথিবীর আকার ধারণপূর্বক উহার উপর ন্যস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে শুরু করিয়াছিল। এই ঐশ্বরিক সত্তাকে ভারতীয়গণ মনুষ্যরূপে বর্ণনা করেন, যিনি আত্মা নামে আবহমণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত, কোনও একটি কল্পিত বৃক্ষের উপর যেন শায়িত অবস্থায় সমস্ত উর্বরতা ঢালিয়া দিতেছেন।
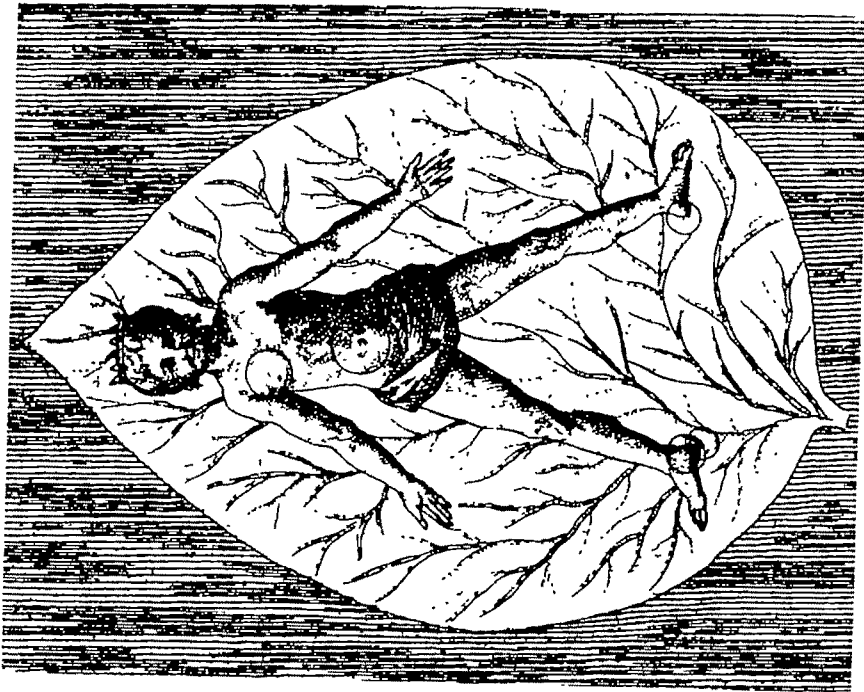
এই প্রতিকৃতিটির দক্ষিণ হস্তের দিকে তাহাদিগের ধারণায় পূর্ব বা **পরুবের কোণ** (পুরবের কোণ) অর্থাৎ দৈব দিক।

বাম হস্তের দিকে দক্ষিণ বা **অক্কি কোন** (অগ্নি কোণ) অর্থাৎ বৃহস্পতির দিক।

দক্ষিণ পদের দিকে উত্তর বা বায়ু কোণ বা বরুণ অর্থাৎ নেপচুন, সমুদ্রের দেবতার দিক।

বাম পদের দিকে পশ্চিম বা **পরিত** কোণ বা **প্রাণপতি** কোণ অর্থাৎ প্রাণী বা জীবিতদিগের দিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

একই মৌলিক স্বভাববিশিষ্ট ও অবিভাজ্য পবিত্র ত্রিত্ব বিষয়ক

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পর্কে ভারতীয়গণের এই ধারণা অনুমান করিয়া আমরা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি যে, তাঁহারা স্বীকার করেন অদ্বিতীয় পরম ঈশ্বরকে, যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জীবের স্রষ্টা।

যেইহেতু আমি যেইরূপ উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, তাঁহারা পবিত্র ত্রিত্বকেও স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইহেতু উক্ত প্রসঙ্গে ইহাও জানাইবার প্রয়োজন যে, তাঁহারা আমাদিগের ন্যায়ই একেশ্বরবাদে আনুগত্য প্রকাশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে এক ও অভিন্ন পরমেশ্বরকে পূজা করেন পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও সঞ্জীবনের কর্তা—এই ত্রিরূপে এবং সমগ্র পবিত্র ত্রিত্ব ও তাঁহার প্রত্যেক দেবতার উপর আরোপিত হয় সমক্ষমতাসম্পন্ন দায়িত্ব ও শক্তি।

ব্রহ্মা-ত্রিত্বের প্রথম দেবতা/রূপ, জাগতিক সকল প্রকার জীবের নামান্তরে **রচকুনের** (রজোগুণ) সৃষ্টিকর্তা এবং এটি দুইটি শব্দের সমষ্টি **রচ** (রজ) যাহার অর্থ ধুলা ও কুন (গুণ) যাহার অর্থ প্রাজ্ঞতা (ব্রহ্মার ক্ষেত্রে)।

প্রকৃতি হইতে বিশ্বের চারিপ্রান্তে মনুষ্য এবং ভূমির অভ্যন্তরে ও উহার উপরিভাগে, জলের গভীরে ও বায়ুমণ্ডলে প্রকৃতির যাবতীয় বিভিন্ন প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করা ও যৌগিক উপাদান হইতে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকারের সকল শ্রেণির জীবের প্রতিটিতে "কল্প" বা "সৃষ্টি ও লয়ের" প্রারম্ভিক গঠনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশেষ গুণাবলি ঢালিয়া দিবার ক্ষমতা এই দেবতার উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণ (বিষ্ণু)-ত্রিত্বের দ্বিতীয় দেবতা/রূপ, লোকমুখে **কৃস্ত** বা কৃষ্ট, খ্রিসতোস (রুশ ভাষায়), নামান্তরে **সত্যকুন** (সত্যগুণ) যে শব্দটি দু'টি নাম বা বিশেষ্য লইয়া গঠিত: সত্য যাহার অর্থ শুদ্ধ ও কুন (গুণ) যাহার অর্থ প্রাজ্ঞতা (বিষ্ণুর ক্ষেত্রে), মিলিত অর্থ শুদ্ধিকারী, মধ্যস্থতাকারী, পৃষ্ঠপোষক ও ত্রাণকর্তা। সমস্ত জীবের লালনপালন এঁর দায়িত্বে।

শিব (মহেশ্বর)-ত্রিত্বের তৃতীয় দেবতা, নবায়নকারী, নামান্তরে **তমোকুন** (তমোগুণ), দুইটি শব্দ লইয়া গঠিত: তম (প্রভূত অন্ধকার), **কুন** (গুণ) যাহার অর্থ প্রাজ্ঞতা (শিবের ক্ষেত্রে)—মিলিত অর্থ রূপান্তরকারী। এই পৃথিবীতে বসবাসকারী রক্ত-মাংসের শরীরবিশিষ্ট সকল জীবের কিয়দংশে জ্ঞাত সময়সীমা অনুসারে জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এঁর উপর ন্যস্ত।

উপরিদর্শিত ত্রিত্ব, ভারতীয়দিগের মতে, একক দেবত্ব, সম শক্তি ও মহত্বসম্পন্ন।

এই ত্রিত্ব বিশেষত চিত্রিত হইয়া থাকেন ভারতীয়দিগের দ্বারা ত্রিমুখী রূপে, এবং ঐশ্বরিক সত্তার সহিত সম্মিলিতভাবে জ্যোতির্বলয় দ্বারা বেষ্টিত চতুরানন রূপে, ইহার সহিত সকল ঐশ্বরিক সত্তা যুক্ত করিয়া তাঁহারা বুঝাইয়া থাকেন সেই ত্রিমুখী দেবতার দ্বারা সমস্ত সৃষ্ট ও পরিচালিত প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নির্ভরশীলতা, যেই কারণে ভারতীয়গণ চতুরাননের সকল দেবতার উদ্দেশ্যে লিখিয়া থাকে: শ্রীশ্রীহরি ৪, **সরো নমো** (শরণম্), অর্থাৎ চতুরানন রূপে বর্ণিত, শ্রীভগবান হরি সহায়।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয়দিগের দ্বারা ভিন্নরূপে স্বীকৃত দেবদূতগণ বিষয়ক

ভারতীয়গণ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় সৃষ্ট এই বিশ্বকে দুইভাবে বুঝিয়া থাকেন।

প্রথমটিতে, বিশ্বে বিরাজমান পৃথিবীবাসীকে তাঁহারা আলোকরূপী দেবদূতগণের গোষ্ঠীভুক্ত ধরিয়াছেন, দ্বিতীয়টিতে, সমস্ত জ্যোতিষ্ককে, যেইগুলি সাধারণভাবে নভোমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকে, পরবর্তী অধ্যায়ে যেইগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইগুলিকে এবং নভোমণ্ডলের সমস্ত দৃশ্যমান সত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

দেবদূত বলিতে তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন সেই সকল ঐশ্বরিক সত্তাকে, যাহাদিগের দ্বারা অন্তরিক্ষের বলয়গুলি পূর্ণ, যাহাদিগকে সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা নিজ নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া নিজ সর্বজ্ঞানী ইচ্ছাপূরণার্থে নিজের সেই নির্বাচিতদিগের নিমিত্তে বা প্রয়োজনে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক উপায়ে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ভারতীয়দিগের মতে সেইগুলি বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা:

সৌরলোক, দেবদূতগণ;

তপোলোক, উচ্চ শ্রেণির দেবদূতগণ;

ব্রহ্মালোক, দ্বিতীয় সারির দেবদূত বা ডানাযুক্ত দেবশিশুগণ;

সত্যলোক, সর্বোচ্চ শ্রেণির ফেরেশতাগণ;

বত মাতারেব (বহুত মাথা), বহু মস্তকবিশিষ্ট;

অগণিরের (অগ্নি), অগ্নিবর্ষণকারী নেত্রবিশিষ্ট;

বত অক্করের (বহুত অক্ষি), বহু অক্ষিবিশিষ্ট;

বত হাথারেব (বহুত হাত), বহু হস্তবিশিষ্ট;

চৌরের বাজু (ছয় বাহু বা পক্ষ), ষট্‌পক্ষবিশিষ্ট।

স্বীয় প্রভুর প্রতি উহাদিগের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের বিচারে এইগুলি সত্যলোক বা **সৌরেরলোক** (সৌরলোক) শুভ এবং **ক্রাবিলোক** (খারাবিলোক?) বা **অসুরেরলোক** (অসুরলোক)—অশুভ হিসাবে বিভক্ত।

শুভ বলিয়া তাহাদিগের নিকট গণ্য হইয়া থাকে তাহারা, যাহারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুযায়ী পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সহিত আজ্ঞানুসরণ করিত ও প্রতিদানে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার নিকট হইতে পরম সুখ বা স্বর্গসুখ লাভ করিত, যাহার গুণে তাহারা কদাপি অবিশ্বাসী হইতে পারিত না।

অশুভ বলিয়া তাহারা গণ্য করিত তাহাদিগকে, যাহারা স্বীয় বিশেষাধিকারের গর্বে গর্বিত হইয়া কেবলমাত্র স্বীয় সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার অনুবর্তী হইবার বিষয়ে অনিচ্ছুকই নহে, অধিকন্তু ফন্দি করিয়াছিল তাঁহার সমকক্ষ হইবার ও নিজ আসন প্রভুর আসনের উর্ধ্বে তুলিবার, কিন্তু উহাদিগের সকল প্রকার অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের কারণে উহাদিগের দম্ভের তুল্য নির্দয়তার সহিত মর্যাদাচ্যুত করা হইয়াছিল, যাহার ফলে উহারা কদাপি সম্ভাষিত হইতে পারে না।

খ্রিস্টধর্মের গুরুদিগের মতে এই ধৃষ্ট নির্লজ্জ ষড়যন্ত্রের নেতা দেন্নিৎসা (Lucifer), ভারতীয়দিগের নিকট সে অসুর, লোকমুখে মহিষাসুর নামে পরিচিত যাহার অর্থ অপরাধী বা বিরুদ্ধাচারী।

সদলবলে অসুর বা শয়তানের এই ষড়যন্ত্র ও বিরুদ্ধাচারিতা ভারতীয়গণ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা এই খণ্ডের শেষে দর্শিত হইয়াছে বিক্ষোভরূপে, যাহা সৃষ্টি হইয়াছে অন্তরিক্ষের জ্যোতিষ্ক নামক সত্তাগুলির দ্বারা, যেইগুলি সর্বশক্তিমান প্রাজ্ঞতা স্বরূপের সহিত যুদ্ধে রত।

অপর দিকে, যেহেতু, মঙ্গলময় দেবদূতগণের আদিরূপের গৌরবদ্যুতি পরিবর্তিত হয় নাই, সেইহেতুই তাহারা উহাদিগের নিকট জ্যোতির্ময় দেবদূত নামে অভিহিত, যেইরূপ দিবাকালীন নক্ষত্রগুলির মধ্যেও কয়েকটি ভারতীয়দিগের দ্বারা ওই দেবদূতগণের নামে পরিচিত; নিজ বৈশিষ্ট্যগুলির আদিম ঔজ্জ্বল্য ম্লানকারী অশুভ আত্মার—জ্যোতিবিহীন দেবদূত নামে অভিহিত, যেই কারণে পূর্ব দিকের বিপরীতে পশ্চিম দিক তাঁহাদিগের নিকট অন্ধকারের রাজ্য নামে পরিচিত এবং কয়েকটি সন্ধ্যাকালীন বা রাত্রিকালীন নক্ষত্র তাঁহাদিগের দ্বারা পরিচিত হইয়াছে অশুভ আত্মাদিগের নামে, যাহা দর্শিত হইবে নক্ষত্ররাজির বর্ণনায়।

লেবেদেভের মূল রচনায় যেভাবে তিনি লিখেছিলেন— বত মাতাৰেৰ

সৌৰ লোক — অগণিৰেৰ

তপ লোক — বত অঙ্কৰেৰ

ব্রহ্মা লোক — বত হাথাৰেৰ

সত্য লোক — চৌৰেৰ বাজু

চতুর্থ অধ্যায়

অন্তরিক্ষের জ্যোতিষ্কমণ্ডল বিষয়ক

কল্প বা সৃষ্টি ও লয়ের রূপান্তরের দিনে ব্রহ্মাণ্ডকে আলোক বিতরণকারী **দীপ্তমনা সর্করেব** (?) নামক অন্তরিক্ষের জ্যোতিষ্কমণ্ডল ও **ক্রুগর নমি** (?) নামক গ্রহগুলির মধ্যে মুখ্যতম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে নিম্নলিখিতগুলি:

প্রথম গ্রহ চন্দ্র, সংস্কৃত ভাষায় সোম অথবা চন্দ্র, বাংলায় সোম বা চাঁদ, যাহার অর্থ প্রথম দিবস।

দ্বিতীয় গ্রহ সংস্কৃতে মঙ্কলঃ, বাংলায় **মঙ্কল*** (মঙ্গল), দ্বিতীয় দিবস।

তৃতীয় গ্রহ মারকিউরি, সংস্কৃত ভাষায় **বুদগ**, বাংলায় বুধ, তৃতীয় দিবস।

চতুর্থ গ্রহ ইউরোপীয়দিগের নামকরণে জুপিটার, সংস্কৃত ভাষায় ইন্দ্র, **লক্ষি** (লক্ষ্মী) বা বৃহস্পতি, বাংলায় **বৃহস্পত** (বৃহস্পতি), চতুর্থ দিবস।

পঞ্চম গ্রহ ভেনাস, সংস্কৃতে শুক্র, বাংলায় শুকর, পঞ্চম দিবস।

ষষ্ঠ গ্রহ সেটার্ন, সংস্কৃত ও বাংলায় একই শব্দ শনি, ষষ্ঠ দিবস।

সপ্তম গ্রহটি দুইটি নক্ষত্র লইয়া গঠিত, উভয় ভাষাতেই **শনিশ ও সৌরী** নামে চিহ্নিত, অর্থাৎ সপ্তম দিবস। এই দিনটির অন্য নাম তাহাদিগের ভাষায় সাত দিন বা **সক্ত মনা (সপ্ত মনা)**, অর্থাৎ সপ্তম দিনব্যাপী ও ইহুদিদিগের মতে—সাব্বাত, অর্থাৎ বিশ্রামের দিন, ল্যাটিন ভাষা অনুযায়ী **সক্ত মনা (সপ্ত মনা)**-র অর্থ সপ্তম প্রভাতব্যাপী, এবং বিশেষত ভারতীয় ভাষায় **সক্ত মনা (সপ্ত মনা)**-র অর্থ সপ্তম জ্যোতিষ্ক।

অধুনা এই সপ্তম দিনটি তাহাদিগের নিকট রবিবার নামে পরিচিত, অর্থাৎ সূর্যের দিন, যেই নামটি ল্যাটিন ভাষাতেও প্রচলিত।

ভারতীয় রাশিচক্রের নকশার তিনটি মুখ্য বিভাগে অবস্থিত **কেন্দের** (?) নামক অন্যান্য নক্ষত্রগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে উহাদিগের জটিল সৌর ও চান্দ্র পদ্ধতির ক্যালেন্ডারে বা পঞ্জিকায়, যেটি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রস্তাবিত হইবে।

কিন্তু এই অধ্যায়ে উহাদিগের গণনাপদ্ধতি বুঝিবার জন্য দুইটি জটিল নক্ষত্রের উল্লেখের প্রয়োজন বলিয়া

মনে করি—**শনিশ** ও **সৌরী**, এই দুইটির মধ্যে যেটির নাম **শনিশ**, সেইটিকে তাহারা রাত্রি গণনায় ও অন্যটি যেটির নাম **সৌরী**, সেইটিকে দিন গণনায় গ্রাহ্য করিয়া থাকেন, বর্তমান সৌরীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সেই দুইটিকে উঁহারা রাহু ও কেতু নাম দিয়া থাকেন।

---

* মঙ্কল-ভারতীয়গণ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকেন যে, এই নাম হইতেই মঙ্কল বা মঙ্গোলীয়গণ তাহাদিগের নামধারণ করিয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

জাগতিক সকল প্রকার জীবের সৃষ্টি বিষয়ক

এইরূপে জগতের উন্মোচন করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা চিনুয়া (চিন্ময়?) নাম্নী প্রাণশক্তি প্রদান করিয়া জীবের সৃষ্টি করিলেন, যথাঃ স্থলে চতুষ্পদ জন্তু ও সরীসৃপ, জলে মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণী, অন্তরিক্ষে পক্ষী ও কীটপতঙ্গ - এবং সমগ্র বসুন্ধরাকে বৃক্ষরাজি, বিভিন্ন লতাগুল্ম, শাকসবজি ও প্রস্তর দ্বারা সজ্জিত করিলেন।

অতঃপর পবিত্র ত্রিত্বের সহমতে তিনি একজন পুরুষ ও একজন নারীকে সমগ্র সম্পদের অধিকারী রূপে সৃষ্টি করিলেন, নিজ নামের অনুরূপ পুরুষটির নামকরণ করিলেন ব্রহ্মা, লোকমুখে ব্রম্হা, এবং নারীটির নাম দিলেন বিশকা (বিশাখা), যাহার অর্থ সহযোগিনী, যিনি ব্রহ্মার শতপুত্রের জননী এবং উত্তরপুরুষদিগের দ্বারা চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে উভয়ের নামই ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

এই প্রথম দিবসটি অতিক্রান্ত হইবার পর, যেইটি বৃহস্পতির চক্রাকার ঘূর্ণনের ফলে সম্পন্ন হয় বলিয়া উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, উপরোক্ত সর্বজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা নিজের অনুরূপ উৎকর্ষ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সেই সকল নাম দেন যেইগুলি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি এবং যেইগুলির মাধ্যমে দেবচরিত্রগুলি, সংযুক্ত অবস্থায় উপাদানগুলির বিবিধ সম্পর্ক, আপন সৃষ্টিকর্তার উপর জীবের অনিবার্য নির্ভরতা বুঝাইবার জন্য তাঁহাদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত করেন নিগূঢ় তথ্য, এবং তাহা হইতে উদ্ভূত পদ ও কর্ম সঙ্ঘটনের মূলে নিহিত কারণসমূহ, অধিকন্তু পৃথিবীর সকল জীবের উপর প্রভুত্ব করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন।

ফলত এই পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদিগের বংশধরগণকে অক্ষররীতি বা লিখিতে শিখাইয়াছিলেন, স্থাপন করিয়াছিলেন শিনাকগাব (শিক্ষাগার?), অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকদিগের আবাস, গির্জা ও পরিবারের সদস্যগণের অনুশাসন।

সেই সময়, সেই জাতির পরিচালকমণ্ডলীর ন্যায়ই, মন্দির নামক আরাধনাস্থলের কর্মকর্তা হিসাবেও গণ্য হইতেন বয়োজ্যেষ্ঠ আদিপুরুষগণ, যাঁহারা উহাদিগের নিকট দোক্কা (দক্ষ), বিয়াস (ব্যাস), মনি (মুনি) ও পবিত্র ধর্মাচার সম্পন্নকারীগণ পুরোহিত নামে আখ্যাত হইতেন।

এই পরম্পরার মাধ্যমে আদিম ভারতীয়গণ বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য সংরক্ষণ করিয়া সেইগুলিকে তাঁহাদিগের পরবর্তী প্রজন্মের হস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন, যাহা অদ্যাবধি তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শকের কাজ করিয়া থাকে (মনুর ধর্মশাস্ত্র)।

ইহা সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় যে, হিবরু ভাষায় গার শিনাই-এর অর্থ সিনাই পর্বত, যাহার উপরে মুসা ঈশ্বরের

সন্তানসন্ততি ইজরায়েলিদিগকে, যাহা ঐতিহাসিকেরা আমাদিগকে যেইরূপ দেখাইয়াছেন বা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অনুযায়ী **দেকা লোক** (দেকালোগ- Decalogue) প্রচার করিয়াছিলেন, ভারতীয় ভাষায় যাহার অর্থ ধ্যান বা ঐশিক দশটি আদেশমালা।

ইজরায়েলি বা ইজরায়েলের ইহুদি জাতির নামের উৎপত্তি প্যাট্রিয়ার্ক ইয়াকব (Patriarch Jacob)-এর নাম হইতে, যেই নামটি "ইজরায়েলি ঈশ্বর" নামের পরিবর্তিত রূপ, যেই নামটির সহিত ভারতীয়দিগের "ঈশ্বরের লোক" (ঐশলোক) নামের মিল পাওয়া যায়, যাহা ঈশ্বরের জনগণ ব্যতীত অন্য কিছু বুঝায় না।

ভারতীয় নাম ঈশ্বর-এর অর্থ ভগবান, এবং লোক-জাতি, অতএব, সিনাই পর্বতে তৎকালে যদি ইহুদি বিজ্ঞানীদিগের বাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইহুদি **গার শিনাই** শব্দটি আসিয়াছে হয় ভারতীয়দিগের **শিনাকগাব** শব্দ হইতে অথবা সিনাই পর্বতে **গারসিনাহ** স্থাপনের সুবাদে ভারতীয় ভাষায় **শিনাকগার** শব্দটি যুক্ত হইয়াছিল।

ভারতীয় ও হিবরুদিগের মধ্যে যে মিল রহিয়াছে তাহার, সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে ধরা যাইতে পারে যে, **কাল দিয়া**, বাইবেলের অনুবাদকগণ যাহার নাম দিয়াছেন **খালদেয়া**, সেই স্থান হইতে আব্রাহামকে ডাকাইয়া পাঠানো হইয়াছিল কানা আন, নামান্তরে **খানা আন** নামক ভূমিতে, তদবধি আব্রাহামের পিতা ফারা, পিতামহ নাখোর এবং প্রপিতামহ এভের, আব্রাহামের খানা আন ভূমিতে যাইবার আগে বসবাস করিয়াছেন **কাল দিয়া** বা **খালদেয়া** নামক স্থানে, যাহা ইন্ডিয়া বা ভারত ব্যতিরেকে অন্য কোনও স্থান নহে; এই পূর্বপুরুষগণ ভারতীয়দিগের নিকটও আদিপুরুষ রূপে সম্মানিত হইতেন এবং প্রায় একই নামে পরিচিত কেবলমাত্র ভাষার উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যের কারণে কয়েকটি অক্ষরের স্থান পালটাইয়া যায়। যথা: তারা-ফারা, নাচোর অথবা নাচুর-নাখোর, এবরু বা আবরু-এভের।

প্রথম সৃষ্ট মানব হইতে জিশুখ্রিস্ট অবধি ভারতীয়দিগের বয়োজ্যেষ্ঠ আদিপুরুষ ও ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা বা দৈবজ্ঞদিগেরও আমাদিগের ন্যায় অনুরূপ নামকরণ হইত ও ভারতীয়দিগের নিকটও তাহারা সমমর্যাদা পাইতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয়দিগের সময় গণনার আদি পদ্ধতি বিষয়ক

নিউ টেস্টামেন্টের শেষ গ্রন্থ বা বেদান্তে যেইরূপ দর্শিত হইয়াছে তদনুসারে, অন্তরিক্ষের জ্যোতিষ্কমণ্ডলগুলিতে পৃথিবীর প্রথম গতিময়তার ফলে, **নিমিক** (নিমেষ) বা ক্ষণ, **কাক্গ** (পল) বা সেকেন্ড ও **মগর্তিক** (মুহূর্ত) বা মিনিট হিসাব করিয়া সময় গণনা শুরু হইয়াছিল।

অতঃপর মিনিট লইয়া গঠিত হয় ঘণ্টা, যাহা দণ্ড বা পল নামে চিহ্নিত এবং ঘণ্টা লইয়া গঠিত হয় **পোরগব** (প্রহর), তিন ভারতীয় ঘন্টায় এক একটি প্রহর, কথ্য ভাষায় যাহা **পোব**।

(ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ও সকাল ছয়টার পর) দুই প্রহর অর্থাৎ ভারতীয় ছয় ঘন্টা অতিক্রান্ত হইলে তাহাদিগের হিসাবে সান্ধি বা মধ্যরাত্রি ও **সুলাবি** বা **সুপাবি** (?) বা মধ্যদিবস হয়।

দিবাকালীন বা রাত্রিকালীন ১২ ঘন্টা করিয়া সময়ে চার **পোরগব** (প্রহর) হয়, যাহার পর ভারতীয়গণ একই পদ্ধতিতে **৬০ ঘন্টা** (?) প্রলম্বিত সময় অবধি দিন ও রাত্রির হিসাব করিয়া থাকেন। দিনবেলা বা বারবেলা নামক দিবাকালীন গণনা প্রক্রিয়া হিসাব করা হইয়া থাকে **বরকনের তারা*** নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকার গতিপথ অনুযায়ী যেইগুলি **চকা** (যোগ) নামক ২৭টি **বৃহৎ** প্রভাতকালীন নক্ষত্রের সহিত সহযাত্রা করিয়া থাকে, যেইগুলির দ্বারা বৎসরকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকে জ্যোর্তির্বিজ্ঞান ও সময় গণনা পদ্ধতি।

কালি বেলা বা **রাত বেলা** বা রাত্রি গণনা করা হইতে **অন্ধকার নক্ষত্র** বা **আন্ধোরা নক্ষত্র** নামক সন্ধ্যাকালীন ক্ষুদ্র নক্ষত্ররাজির দ্বারা যেইগুলি নাচাত্রা তারা নামক ২৭ টি বৃহৎ রাত্রিকালীন নক্ষত্রের সহিত সহযাত্রা করিয়া থাকে।

তাঁহাদিগের চান্দ্র মাস, তিথি নামক ৩০টি দিন লইয়া গঠিত, প্রতিটি মাসকে তাঁহারা দুইটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন, প্রথমটি প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা ও দ্বিতীয়টি পূর্ণিমা হইতে উহার ক্ষয় অবধি।

প্রথম বিভাগ হিসাব করা হয় প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা অবধি, যাহা তাঁহাদিগের নিকট **কননা** শুক্ল পক্ষ (শুক্ল পক্ষ গণনা) নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় বিভাগ, যাহা ধরা হইয়া থাকে পূর্ণ কলা হইতে উহার ক্ষয় অবধি, **কৌণ চন্দ্র** বা **কণনা কৃষ্ণ** নামে পরিচিত।

প্রতিটি মাসের প্রথম দিনটির নাম:

পেরতোমো তিথি, নামান্তরে এক প্রতিপদ-প্রথম দিন

দোসরা তিথি বা দ্বিতীয়া প্রতিপদ-দ্বিতীয় দিন

তৃতীয় তিথি বা তেসরা প্রতিপদ-তৃতীয় দিন

চতোরতয় তিথি বা **চৌতা** প্রতিপদ-চতুর্থ দিন

পঞ্চই তিথি বা পাঁচই প্রতিপদ-পঞ্চম দিন

ষষ্ঠই তিথি বা **চোই** (ছয়ই) প্রতিপদ-ষষ্ঠ দিন

সপ্তই তিথি বা সপ্তই প্রতিপদ-সপ্তম দিন

অতহ তিথি বা আটই প্রতিপদ-অষ্টম দিন

নবম তিথি বা নয়ই প্রতিপদ-নবম দিন

দশই তিথি বা দশম প্রতিপদ-দশম দিন

একাদশই তিথি বা **একারোহ** (এগারোই) প্রতিপদ-একাদশ দিন

দুয়াদশই তিথি বা বারই (বারোই) প্রতিপদ-দ্বাদশ দিন

ত্রিয়দশই তিথি বা তেরই (তেরোই) প্রতিপদ-ত্রয়োদশ দিন।

চতুরদশী তিথি বা চোদ্দই (চোদ্দোই) প্রতিপদ-চতুর্দশ দিন।

পঞ্চদশ দিবসটিকে কেবলমাত্র **পন্দ্রোই** তিথি বা পনেরোই প্রতিপদ অর্থাৎ পঞ্চদশতম দিন বলা হয় না, বলা হয় **পুর নমা** বা **পুর্ণি নমা** অর্থাৎ পূর্ণকলা।

সমভাবে ষোড়শ দিবসটিকেও কেবলমাত্র ষোলোই তিথি বা ষোড়শই প্রতিপদ অর্থাৎ ষোড়শতম দিন না বলিয়া আবার পেরতোমা তিথি বা এক প্রতিপদ অর্থাৎ পূর্ণিমার পর প্রথম দিন এবং এইভাবে ক্রমানুসারে গণনা করা হইয়া থাকে ৩০-তম চান্দ্র দিবস অতিক্রান্ত হইবার পর চন্দ্র অদৃশ্য হওয়া অবধি, এই দিনটিকেও তাঁহারা ত্রিশতম দিন না বলিয়া, বলিয়া থাকেন অমাবস্যা, যাহা চন্দ্রের বা উহার অর্ধাংশের অদৃশ্য হওয়া বুঝায়, যাহার নাম সংক্রান্তি।

অমাবস্যা, ক্যালেন্ডার সারণিগুলিতে বুঝানো হইয়া থাকে কোনও কোনও মাসে শব্দটির উল্লেখের পরিবর্তে দুইটি দিনে একই সংখ্যার পুনর্লেখনের মাধ্যমে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি শব্দ দ্বারা—অমা বা উমা।

অমাবস্যার পরবর্তী প্রতিটি প্রতিপদকে বলা হইয়া থাকে **শুকল পক্ষ** (শুক্ল পক্ষ) বা **কাল্য মুখ্য চন্দ্র** (?)।

চন্দ্রের আরোহণ-উদয়।

তাহার অবরোহণ-অস্ত বা **উস্ত**।

চন্দ্রকলার পূর্ণক্ষয়ের নাম **ব্রইদ্ধ্য**, লোকমুখে ব্ররদ্ধ্য বা ব্রিদ্ধ্য (বৃদ্ধি)।

প্রতিটি মাসে ৩০ দিন করিয়া, এই দুইটি চান্দ্র বিভাগ অনুযায়ী হিসাব করিয়া, ভারতীয়গণ ১২ মাসে এক চন্দ্র বৎসর হিসাব করিয়া থাকেন, যেইগুলির মধ্যে অন্তরিক্ষে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বৃত্তাকারে ঘূর্ণনকালে প্রথম মাসটির নাম দেওয়া হইয়াছিল চৈত্র মাস নামান্তরে **চেইত্র মেইনা**, যেইটি তৎকালে নূতন ইউরোপীয় মাস অনুযায়ী ১১ মার্চ তারিখে পড়িত, যেটি তাঁহাদিগের সৌর পদ্ধতি অনুযায়ী অধুনা সর্বশেষ অর্থাৎ দ্বাদশ মাস বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।

১২ মাস লইয়া গঠিত বৎসরে, প্রথম সত্য যুগে, সূর্যের আবির্ভাবের পূর্বে, ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি মাসে দিনের হিসাব অনুযায়ী ৩৬০ দিন ধরা হইত, যাহা প্রতি বৎসর কোনও কোনও মাসে পরিবর্তনসাপেক্ষ।

---

* বরকনের তারা-সম্ভবতঃ অরুন্ধতী নক্ষত্র। বিবাহের কুশণ্ডিকাকালে মন্ত্র উচ্চারণের সময় নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখানো হয়ে থাকে। ইনি পতিভক্তি ও পাতিব্রত্যের আদর্শ ছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

চারিটি ভারতীয় যুগ বিষয়ক

ভারতীয়গণ প্রারম্ভিক সময়ের বৎসর গণনাপদ্ধতিতে বৎসরকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ও তাঁহারা অদ্যাবধি একইভাবে বৎসরকে ভাগ করিয়া থাকেন। বিভাগগুলির প্রতিটির নাম সেইরূপ নহে যেইরূপ **চন্স** (স্যার উইলিয়াম জোনস্) ও **ডেভিস** (ডেভিস জন) নামকরণ করিয়াছিলেন—**মনভানতিরা** বা **মনভানতারা** (মন্বন্তর), যাহার অর্থ **চন্স** (স্যার উইলিয়াম জোনস্)-এর বিবৃতি অনুযায়ী সময়ের অনুবর্তন, যাহা ৪৩,২০,০০০ বৎসর এবং ডেভিসের সাক্ষ্য অনুযায়ী ১,৭০,৬৪,০০০ বৎসর লইয়া গঠিত। **মন্বন্তরা** শব্দটি দু'টি শব্দের দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, যাহার অর্থ মন (অন্তরিক্ষ) ও অন্তরা (সমাপ্তি) প্রতিটি ভগ্নাংশ এক ভিন্ন বাৎসরিক হিসাব অনুষায়ী ৭১টি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রভাত ও সন্ধ্যাকালীন নক্ষত্রের গতির দ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে।

নিম্নে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে, প্রকৃতি রাজ্য বিষয়ক প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত প্রকৃতি রাজ্য, যাহার নিকটে বৃহস্পতির ৭১ বার চক্রাকার ঘূর্ণন ও প্রতিটি ঘূর্ণনের সময় ১২ বৎসর অনুমান করিয়া যুগের প্রথম ভাগ অর্থাৎ ৮৫২ বৎসর হয়।

বৃহস্পতির ১৪২টি চক্রাকার ঘূর্ণনে ১৭০৪ বৎসরে মনু নামক অর্ধযুগ হয়।

দুই অর্ধযুগ (দুই মনু) বা এক পূর্ণযুগ সম্পন্ন হয় ৩৪০৮ বৎসরে।

উক্ত চান্দ্র পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত প্রথম যুগের স্থায়িত্বকাল ৩৪০৮ বৎসরের সহিত, ইহার পরের সৌরীয় যুগগুলি ব্যতিরেকে, সৃষ্টি ও লয়ের দিনটিকে যোগ করিয়া চান্দ্র পদ্ধতির আবিষ্কর্তা ব্রাহ্মণ **শাস্বতী** (ভাস্বতী?), ঐশ্বরিক সত্তার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতিতে রূপান্তরের এই দিনটির নামকরণ করিয়াছিলেন একটি দিনের নামে— সত্য যুগ, যাহা বৃহস্পতির ১২ বৎসর চক্রাকারে ঘূর্ণনের সময়ের সমান, যাহা যোগ করিলে প্রথম যুগটি সম্পূর্ণ হয় ৩৪২০ বৎসরে।

চন্দ্রের প্রারম্ভিক যুগের অবসানে আলোক দ্বারা আবৃত সমগ্র ঐশ্বরিক অস্তিত্বের সত্য যুগে রূপান্তরের পূর্বে নভোমণ্ডলের কর্তা, সর্বজ্ঞানী ব্রহ্মার ভূলোকব্যাপী সহায়তার প্রহরী অসুর, নিম্নলিখিত ধূর্তামির দ্বারা নভোমণ্ডলে এক ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ ঘটায়।

ইতিপূর্বে দর্শানো হইয়াছে যে, এই পৃথিবীর পুনর্স্থাপনে বৃহস্পতি বা লক্ষ্মী (?), যাহার অর্থ মানবপ্রিয়া,

ইউরোপীয় ভাষায় যিনি জুপিটার, তিনি ছিলেন অন্তরিক্ষের জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতি ও কাল পরিবর্তনের প্রথম সূচনাকারী।

ভারতীয়গণের তাঁহাদিগের বৃহস্পতি সম্পর্কে অন্য এক উপলব্ধি:

সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা স্থির করিলেন লক্ষ্মী বা ইন্দ্রাণী যেন প্রাজ্ঞতাস্বরূপের সহকারিণী, অর্থাৎ বৃহস্পতি ও তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ বিশ্বের প্রভু, যাহা অসুর বা শয়তানের যারপরনাই বিরক্তির কারণ হয়। সমগ্র বিশ্বে প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা তাহার উপর ন্যস্ত হয় নাই দেখিয়া সে (অসুর) তাহার স্ত্রী পূর্ণবীকে, যাহার নামে সন্ধ্যাকালীন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে একটি চিহ্নিত, সম্মত করে শনিশ ও সৌরী নামক দু'টি জ্যোতিষ্ককে বিক্ষোভে প্ররোচিত করিতে এবং নভোমণ্ডলের নানাবিধ শক্তিকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে, যেই কর্মে পূর্ণবী সাফল্য লাভ করে।

অতঃপর, অসুর, প্রলোভনের মাধ্যমে, ব্রহ্মার আইন লঙ্ঘনকারী অসৎ সন্তাগণ, যাহাদিগের মধ্যে প্রাজ্ঞতাস্বরূপের মস্তকের মুকুটের ন্যায় মুকুট পরিহিত দশটি মস্তক ও বিভিন্ন অস্ত্রে বলীয়ান বিশ বাহুবিশিষ্ট দ্বিপদি সেনাপতি বা দানব রাবণ বা রাবুণ ছিল প্রধান, তাহাদিগের সহিত একযোগে ইন্দ্রাণী ও তাহার স্বপক্ষীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিয়া জয়ী হইয়া দেবতাদিগকে পৃথিবীর এক সঙ্কীর্ণ অংশে সরিয়া যাইতে বাধ্য করে।

অসুর এইরূপ ধূর্ত চক্রান্ত করিয়া অন্তরিক্ষের শক্তিগুলির মধ্যে ক্ষতিকারক অভ্যুত্থান ঘটাইয়া বিশ্বের নিয়মশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করিল এবং ইন্দ্রাণী ও তাঁহার বাহিনীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভের গর্বে গর্বিত হইয়া কৌশলে নিজের শঠতার দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকেও একই প্রকার বিরুদ্ধতায় সম্মত না করিয়া ছাড়িল না, নিজেকে সর্বজ্ঞানী, দুর্জ্ঞেয় ও প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া জাহির করিয়া প্রলুব্ধ করিল সঠিক মঙ্গল সম্পর্কে উদাসীন জাতিকে তাহার উপাসনা করিতে এবং ইহার দ্বারা সর্বশক্তিমান ব্রহ্মার এতদূর চক্ষুশূল হইয়া উঠিল যে, তিনি বিরূপতা উদ্রেককারী অসুরের ঔদ্ধত্যের শাস্তি না দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না।

লক্ষ্মী বা বৃহস্পতি নামান্তরে ইন্দ্র, লোকমুখে ইন্দ্রা, অসুরের দ্বারা সৃষ্ট নিজের ও সমগ্র মানবজাতির উপর অসহনীয় চাপ বা সীমাবদ্ধতা সহ্য করিতে না পারিয়া সর্বশক্তিমান ত্রিমূর্তির নিকট অনুরোধ জানাইলেন স্বর্গে ও মর্তে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে, যাহাতে সহমত হইয়া সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা দয়াপরবশ হইয়া এই কাজের জন্য প্রাজ্ঞতাস্বরূপিণী দুর্গার আবির্ভাব অনুমোদন করিলেন, যাহার স্মরণে নিজদিগের সকল মন্দিরে তিনি চিত্রিতা দুই হস্ত ও পদবিশিষ্ট মূর্তি রূপে যাঁহার হস্তে তিরযুক্ত ধনুক, কণ্ঠে ও বক্ষে মুক্তাসদৃশ গহনা ও সুতায় বাঁধা কুঠার। তাঁহার পশ্চাতে ধনুকসহ একই প্রকার সাজে চিত্রিতা তাঁহার আস্থাভাজন লক্ষ্মী অর্থাৎ জুপিটার বা বৃহস্পতি নিজ পদযুগলের নিকট মজুত বানরকুল যাহারা নিজদিগের তির নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল উপরিউল্লিখিত দশ মস্তক ও বিশ বাহুবিশিষ্ট রাবণ বা রাবুণ নামক রাক্ষসকে, যাহার নামের অর্থ নরখাদক। তাহার পায়ের কাছে চিত্রিত কোনও এক কিম্ভূত জীব, যেটি দৈর্ঘ্যে মৎস্য বা সর্পসদৃশ, হাঁ করা মুখ ও হুলযুক্ত ভয়ঙ্কর মস্তকবিশিষ্ট, হস্তীর শুঁড়ের ন্যায় উচ্চ ঊর্ধ্ব চোয়াল কাস্তের ন্যায় ধারালো, দন্তে পূর্ণ নিম্ন চোয়ালটিও, উক্ত জীবটির ঘাড় হইতে শুরু করিয়া দেহটি সাতটি গোলাকৃতি খণ্ডে গঠিত, পুচ্ছবিশিষ্ট, যেটি মৎস্যপুচ্ছ অপেক্ষা অধিক পক্ষীপুচ্ছসদৃশ।

অন্যান্য ভারতীয় মন্দিরগুলিতে প্রাজ্ঞাতস্বরূপা দুর্গাকে কল্পনা করা হয় মেঘের তলদেশে, তাঁহার চারিহস্তে

বেড়ি ও পদযুগলে কঙ্কণ, মস্তকে মুকুট, ক্রুদ্ধ আনন ও মুখগহ্বর হইতে প্রলম্বিত জিহ্বা, হাঁটু অবধি ঝুলন্ত দুইটি বেণি ও দুইটি বেণি স্কন্ধের উপর ন্যস্ত, কণ্ঠে মুক্তার মালার ন্যায় তিনটি তারকাকৃতি গহনা—দুইটি মালা বক্ষে ও একটি নাভি অবধি, ও বাম কর্ণ হইতে নাভির নিকটে বেষ্টন করিয়া গলার দক্ষিণ পার্শ্বে ঝুলন্ত সর্প, যাঁহার দেহের উপরিভাগ বিশ্বাসঘাতক প্রেতদিগের মুণ্ড দ্বারা পূর্ণ, প্রাজ্ঞতাস্বরূপার পদতলে শিব, ত্রিত্বের এক দেবতা ভূমিতে শায়িত, তাঁহার বাম হস্তে ধৃত চোঙার মতো শিঙা, উত্থিত তর্জনী, যাহার দ্বারা তিনি রুষ্ট অবস্থায় প্রাজ্ঞতাস্বরূপাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, প্রাজ্ঞতাস্বরূপা ক্রোধোন্মত্তা হইয়া নিজের পতিদেবতার গাত্রে পদক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা শুনিয়া প্রাজ্ঞতাস্বরূপা লজ্জায় জিহ্বা বাহির করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার প্রবল বিস্ময়ের উদ্রেক হওয়া বুঝায়; উত্থিত প্রথম দক্ষিণ হস্তের তালু বুঝাইতেছে যে, তিনি শিবকে শান্তিস্থাপনের প্রস্তাব দেন এবং দ্বিতীয় নত হওয়া তালু সমেত দক্ষিণ হস্ত শিবকে নিজের শুভকামনা জানাইবার কথা বুঝাইতেছে, তাঁহার প্রথম বাম হস্তে ধরা তরবারি এবং দ্বিতীয় বাম হস্তে মুষ্টিবদ্ধ রহিয়াছে ছিন্ন মুণ্ডের কেশগুচ্ছ। এই চিত্রে শবদেহ ভক্ষণের উদ্দেশ্যে সমবেত বিভিন্ন জন্তু, যথা শিয়াল, কাক ইত্যাদিও স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু যখন ওই একই দুর্গা বলিতে অসীম ও সর্বত্র বিরাজমান প্রাজ্ঞতাস্বরূপ সৃষ্টিকর্তাকে বুঝানো হইয়া থাকে তখন তাঁহাকে চিত্রিত করা হয় কেবলমাত্র বহুভুজা রূপে নহে, পরন্তু বিভিন্ন অস্ত্র সমেত, অসুর নামক অশুভ শক্তির উৎস ও শান্তি বিনষ্টকারী/জগৎ ধ্বংসকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধরতা রূপে।

কোন রূপে প্রাজ্ঞতাস্বরূপা দুর্গা স্বয়ং অসুরকে অর্থাৎ শয়তানকে বধ করেন এবং কীভাবে ভারতীয়গণ ক্রমপরম্পরায় অসুরের সহিত তাঁহার বাহিনীর এই যুদ্ধের চিত্রটি কল্পনা করিয়া থাকেন, যাহার ভিত্তিতে তাঁহাদিগের বাৎসরিক উৎসবগুলির উৎপত্তি, এই স্থানে সেই চিত্রটি ও উহার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে।

ভারতীয়দিগের আইকন বা পবিত্র চিত্রের (পট) বিভিন্ন সারিতে পাঁচটি প্রকোষ্ঠে উপস্থাপিতা প্রাজ্ঞতাস্বরূপা দুর্গার চিত্রের ব্যাখ্যা

চিত্রটির ঠিক মধ্যস্থলে উপরের সারির নিম্নে মুকুট পরিহিতা নিষ্পাপ বালিকা রূপে তাঁহারা চিত্রিত করিয়াছেন ঈশ্বরের প্রাজ্ঞতার প্রতিমূর্তি দেবী দুর্গাকে, তাঁহার মুখটি ফিরানো কন্যা লক্ষ্মী, যিনি বৃহস্পতি নামে পূজিতা এবং ত্রিত্বের তৃতীয় দেবতা শিবের দিকে, যাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা, বাম কর্ণের নিম্নে ক্ষুদ্রাকার বৃত্ত, যেটি সম্ভবত পূর্ণচন্দ্রের প্রতীক, কণ্ঠে ও বক্ষে মুক্তাসদৃশ বস্তুর গহনা, বাম কর্ণ হইতে উদর অবধি কণ্ঠের দক্ষিণ দিক জুড়িয়া ঝুলিতেছে সর্প, সাধারণভাবে যাহা জ্ঞানের প্রতীক রূপে গণ্য হইয়া থাকে। স্বয়ং প্রাজ্ঞতাস্বরূপা দুর্গা চিত্রিতা সর্বক্রিয়াক্ষম অন্য এক শক্তি ও দুর্গের প্রতীকস্বরূপ তীব্র ক্রোধ প্রকাশের দ্বারা শান্তিপ্রয়োগে প্রস্তুত দশভুজা রূপে।

অপরাধীদিগকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া আছেন পরশু।

দ্বিতীয় হস্তে-রাজদণ্ড, সর্বোচ্চ প্রাজ্ঞতাস্বরূপের একাধিপত্যের প্রতীক।

তৃতীয় হস্তে-ব্যঙ্গ হইতে রক্ষার্থে কুঠার বা ঢাল।
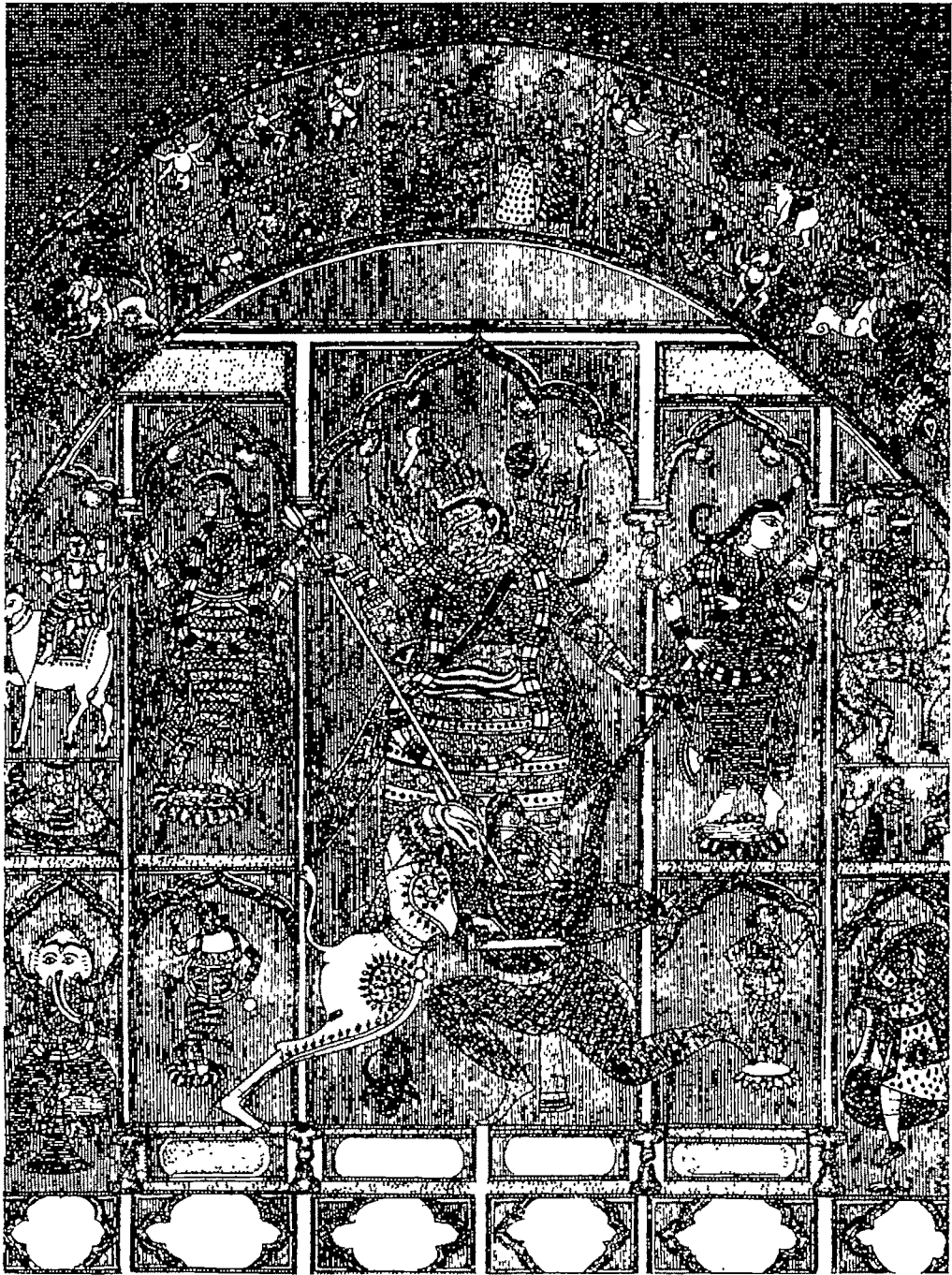
চতুর্থ হস্তে—অঙ্গুরীয় বা গৌরব দ্বারা ভূষিত মুকুট।

পঞ্চম দক্ষিণ হস্তে—বর্শা, যাহা দিয়া তিনি অসুর বা মহিষাসুর নামক প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেন।

বাম পার্শ্বে প্রথম বাম হস্তে তিনি ধরিয়া আছেন তাঁহার বিরুদ্ধাচারীর দম্ভ চূর্ণ হইবার প্রতীক কৃষ্ণবর্ণের গোলা।

দ্বিতীয় হস্তে—অসুর দমনে উদ্যত দণ্ড।

তৃতীয় হস্তে—প্রাজ্ঞতাস্বরূপার স্বপক্ষীয়গণকে এই সম্মানহানির ঘটনায় আহ্বান করিবার নিমিত্ত ঘণ্টা।

চতুর্থ হস্তে—যথার্থ বিজয়দৃপ্ত শক্তির প্রতীক ধনুক।

পঞ্চম বাম হস্ত একটি সর্পকে ছাড়িয়া দিতেছে, যেটি প্রতিপক্ষ অসুর অর্থাৎ শয়তানের হস্ত বাঁধিয়া দিয়া মস্তকে চড়িয়া তাহার মুকুটটিকে টানিয়া ফেলিয়া দিতেছে।

যেইরূপ এই দশ বাহুতে হস্তালঙ্কার, সেইরূপই তাঁহার সকল অঙ্গবস্ত্র কল্পিত হইয়াছে ভারতীয় যুবতী ও স্ত্রীদিগের পোশাক-পরিচ্ছদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া।

প্রাজ্ঞতাস্বরূপা দেবী দুর্গার পদতলে দুই যুযুধান প্রতিপক্ষকে কল্পনা করা হইয়াছে।

উহাদিগের মধ্যে দক্ষিণ পদপ্রান্তে চিত্রিত একটি ভারতীয় শ্বেত সিংহ (আমাদিগের জানা প্রজাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক), যেটি অসুরের দক্ষিণ হস্তে সজোরে কামড় বসাইয়াছে।

অপরটি, বাম পদপ্রান্তে চিত্রিত প্রতিপক্ষ অসুর অর্থাৎ শয়তান, যাহার মস্তক হইতে মুকুট পড়িয়া গিয়াছে, কণ্ঠে ও বক্ষেমুক্তা সদৃশ হৃদয়াকৃতির তিন গাছি মালা, ঝুলিয়া থাকা দক্ষিণ হস্তে ধরা উন্মুক্ত তরবারি ও বাম হস্তে ধৃত তরবারির কোষ, দলিত দুই হস্ত সর্পবেষ্টিত।

এই দুই প্রতিপক্ষের হাঁটুর নিম্নে উহাদিগের পদমধ্যবর্তী স্থানে শৃঙ্গবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ বৃষের ছিন্ন মুণ্ড ও উহার দুই কান অবনত, যাহা ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের শাস্তিভোগ ও গভীর আসক্তিতে লাগাম টানিয়া নিয়ন্ত্রণের প্রতীক।

দুর্গার দক্ষিণ পার্শ্বে, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে, উপরের সারির তলদেশে, সমভাবে শিবের দিকে মুখ করিয়া আছেন শান্ত যুবতীর রূপে চিত্রিতা ঐশ্বরিক সত্তাদিগের মধ্যে একজন, যাঁহার নাম লক্ষ্মী, শস্যমঞ্জরীর মুকুটে ভূষিতা, কণ্ঠে ও বক্ষে দুর্গার ন্যায় অলঙ্কার, হস্তে ধৃত ফলদায়ী বৃক্ষরাজির পল্লবশাখা দ্বারা বেষ্টিতা, যাহার বৃক্ষমূলে তিনি দণ্ডায়মানা; দুর্গার ন্যায় তাঁহার বক্ষেও ঝুলন্ত সর্প যাহা প্রাজ্ঞতার (দুর্গা) আনুকূল্যের প্রতীক।

লক্ষ্মীর নিম্নে, দ্বিতীয় সারির তলদেশে, হস্তীমুখবিশিষ্ট দেবতা গণেশের দিকে মুখ করিয়া স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সদানন্দ নন্দী, যাহার উত্থিত দক্ষিণ হস্তে ধৃত দর্পণটি তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে এবং ভর দিয়া থাকা বাম হস্তে রহিয়াছে একটি কাচের খণ্ড; তাহার বাম কর্ণ হইতে উদর পার করিয়া ডান কর্ণ অবধি ঝুলন্ত সর্প বুঝায় যে, আমোদ-প্রমোদ ও রঙ্গ-রসিকতা। সতর্কতা ও বুদ্ধির সহিত করা উচিত।

লক্ষ্মীর দক্ষিণ পার্শ্বে, উপরের সারির তলদেশে, তৃতীয় প্রকোষ্ঠে দুর্গা ও লক্ষ্মীর সহিত সম উচ্চতায় চিত্রিত রহিয়াছেন পবিত্রতা ও আধিপত্যের প্রতীক শ্বেত বৃষপৃষ্ঠে পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় দেবতা শিব, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে

শিঙা, বাম হস্তে ডমরু—বিজয়োল্লাসের দ্যোতক; দুর্গার ন্যায় তাঁহার বক্ষেও সর্প ঝুলানো, যাহা তাঁহাদিগের একক জ্ঞানসম্পন্নতা বুঝাইয়া থাকে।

শিবের পদতলে, তৃতীয় প্রকোষ্ঠের নিম্নতলে একটি নৌকায় নন্দি ও **ব্রিঙ্কি** (ভৃঙ্গি) নামক দুই **পরি** (শিবের অনুচরদের পরি ভাবার কারণ সম্ভবত স্ত্রীলিঙ্গের নামের শেষের মতো নন্দি, ভঙ্গি নামের শেষের ই কারঅনুবাদক) , মস্তকে **নৌকাকৃতি আলোক** (সম্ভবত প্রদীপ) লইয়া দুর্গার সহযোগী শিবের নিকট যাত্রাপথের সঙ্গী রূপে চিত্রিত, যাহার স্মরণে উৎসব পালনের পর ভারতীয়গণ প্রতি বৎসর দুর্গামূর্তি গঙ্গা নদীতে বিসর্জন দিয়া থাকেন, যাহা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হইবে উৎসব বিষয়ক অধ্যায়ে।

নৌকার নিম্নে দ্বিতীয় সারিতে, চিত্রিত এক পুরুষ, যিনি দৈবিক সত্তাদিগের একজন ও গণেশ নামে পরিচিত, যাহার নামের অর্থ জ্ঞানী। প্রাজ্ঞ চিত্রটিতে মনুষ্যরূপী গণেশ বসিয়া আছেন সিংহাসনে, শ্বেত হস্তীর নিকট হইতে প্রাপ্ত মস্তক বিশেষ রূপে ভূষিত, চারিটি প্রসারিত আশীর্বাদী হস্ত ও দুই পদবিশিষ্ট, কণ্ঠে ও বক্ষে মুক্তাসদৃশ বস্তুর গহনা, তাঁহার বাম কর্ণ হইতে উদরদেশ হইয়া দক্ষিণ কর্ণ অবধি সর্প ঝুলিতেছে; এই দৈবিক সত্তাকে ভারতীয়গণ তাঁহাদিগের প্রার্থনা পরমেশ্বরের নিকট পৌঁছাইবার ক্ষেত্রে ঈশ্বর ও মনুষ্যগণের মধ্যে সংযোগের এক শক্তিশালী মাধ্যম বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন যেই কারণে, গণেশ পূজার দিন, সমগ্র ভারত হইতে অগণিত মানুষ গণেশ মন্দির **চকরনতে** (?) সমবেত হয় এই প্রার্থনা লইয়া যাহাতে গণেশ, পরমেশ্বরের নিকট তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূরণের আবেদন করেন।

এই মন্দির, অর্থাৎ গণেশ মন্দিরটি মারাঠা সম্রাটের অধিকৃত অঞ্চলে অবস্থিত, যে রাজ্যের অধিবাসীগণ সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত **উড়িয়া** নামক এক বিশেষ উপভাষায় কথা বলিয়া থাকে।

উপরের সারির নিম্নে, দুর্গার বাম দিকে, তাঁহার একই উচ্চতায় চতুর্থ প্রকোষ্ঠে চিত্রিতা শিল্প ও বিজ্ঞানের দেবী সরস্বতী, যেই দেবী হইতে মসিজীবী শ্রেণির উৎপত্তি; তিনি শান্তরূপে দণ্ডায়মানা, বিন্যস্ত, কুঞ্চিত কেশের বেণির চূড়ায় শ্বেত বর্ণের একটি গোলাকৃতি বস্তু, যেটির মধ্যে আরও দুইটি দাগ কাটা গুটি কা, যেইগুলির উপরে অঙ্গুরিসদৃশ একটি চক্রবলয়, কণ্ঠে ও বক্ষে মুক্তামালাসদৃশ অলঙ্কার, একই রূপে সর্প দ্বারা বেষ্টিতা, হস্তে সরু পত্রহীন শর গাছের শাখা, যাহা হইতে ভারতীয়গণ সাধারণত তাঁহাদিগের লিখিবার খাগের কলম তৈয়ারি করিত।

সরস্বতীর পদতলে, দ্বিতীয় সারিতে, বাম দিকে কার্তিকেয়র দিকে মুখ করিয়া সচ্ছন্দ ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে **ব্রিঙ্কি** (ভৃঙ্গি) বাম হস্তের উপর ভর দিয়া এবং উত্থিত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্বর্গের আইনরক্ষাকর্তা কার্তিকেয়কে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে তিনি যেন অসুর বা শয়তানের ন্যায় না হইয়া দেবীর মন্দিরের বিশ্বস্ত প্রহরী রূপে থাকেন।

সরস্বতীর বাম দিকে সম উচ্চতায় পঞ্চম প্রকোষ্ঠে চিত্রিত রহিয়াছেন দুর্গার মুকুটের অর্ধেক উচ্চতার মুকুট পরিহিত রাম নামক এক সত্তা, তাঁহারও কণ্ঠে ও বক্ষে একই প্রকার গহনা ও সর্প, তিনি হনুমানপৃষ্ঠে চলিয়াছেন, বাম হস্তে ধৃত ধনুকের অবস্থান এইরূপ যেন তাহা হইতে তির নিক্ষেপ করা হইয়াছে। রাম ভারতীয়দিগের নিকট পূজিত হন কেবলমাত্র ধর্মপ্রাণ মনুষ্যদিগের পৃষ্ঠপোষক ও তাঁহাদিগকে শয়তানের জাল হইতে রক্ষাকর্তারূপে।

রামের চিত্রটির নিম্নে প্রদর্শিত হইয়াছে দুই **পরির/উপদেবীব** (?) মধ্যবর্তী স্থানে মাথায় **নৌকাকৃতি আলোকসহ** (প্রদীপ) প্রাজ্ঞতাস্বরূপা দুর্গা এবং বাম হস্তে দণ্ড লইয়া লক্ষ্মী, যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট শিবকে উপদেশরতা, যাহাতে শিব সহযোগী দুর্গাকে ভবিষ্যতে অধিকতর যত্ন করেন ও নিজ গৃহে রাখেন।

উপরিবর্ণিত দুই পরি (?) এবং সিংহাসনে উপবিষ্ট শিবের চিত্রের নিম্নে ও দ্বিতীয় সারির নিম্নে পঞ্চম প্রকোষ্ঠে দুর্গার দিক হইতে বাম পার্শ্বের দ্বিতীয় স্থানে শেষ চিত্রটি কার্তিকেয়র, যিনি দণ্ডায়মান, আলোকবেষ্টিত, মস্তকে অসুরের মুকুটের ন্যায় মুকুট, উত্থিত দক্ষিণ হস্তে এক ধরনের তির এবং সম্মুখে প্রসারিত বাম হস্তে ধনুক, তাঁহার জমকালো পোশাক যেন নক্ষত্রখচিত এবং অসি সমেত কোমরবন্ধের দ্বারা বেষ্টিত, যাহার মধ্যস্থলে একটি বলয়, তিনি ময়ূরপৃষ্ঠে আসীন। এইরূপ চিত্রিতকরণ দেখাইতেছে যে, অতঃপর অসুরের পরিবর্তে কার্তিকেয়ই সমগ্র বিশ্বের প্রহরী ও আইনরক্ষাকর্তা।

সর্বোচ্চ সারিতে বা চালচিত্রে বিভিন্নরকম ভঙ্গিমায় চিত্রিত রহিয়াছেন সেই একই স্ত্রী ও পুরুষ ঐশ্বরিক সত্তাগণ, যাহারা মিত্রপক্ষরূপে বিরুদ্ধাচারীদিগের উপর প্রাজ্ঞতাস্বরূপার ইচ্ছাপূরণে লিপ্ত।

এই সকল রূপক বর্ণনা পুরাকালের কল্পিত সাধারণ লোককাহিনি বলিয়া মনে হইতে পারে।

পরন্তু ইহা আশ্চর্যজনক নহে এই কারণে যে কেবলমাত্র ভারতীয়গণই নহে এমনকি সমগ্র পৃথিবী কিয়দ্দিবস অবধি ঈশ্বরজ্ঞান সম্পর্কিত সম্যক ধারণা হইতে বঞ্চিত ছিল; এবং যখন অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরকে মান্য করিত তখন ভারতীয়গণ, ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, **মালোখ** নামান্তরে **মা লোক**-এর সম্মুখে মাথা নত করিতেন অর্থাৎ প্রাজ্ঞতাস্বরূপা মায়ের উপাসনা করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অদ্যাবধি প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদ, তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষ ও আগন্তুকদিগের কতিপয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন জট পাকানো খ্রিস্টধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ভূমিকা ও প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায় হইতে যাহা কিছুদূর স্পষ্ট।

সর্বত্র ও এই স্থানে বর্ণিত সকল ঐশ্বরিক সত্তামাত্রই, যেইরূপ কয়েকজন ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দ্বারা দেবদেবী হিসাবে বিশেষভাবে স্বীকৃত/পূজিত হয়, এমনটি নহে। কিন্তু এই সকল স্ত্রী ও পুরুষ ঐশ্বরিক অস্তিত্বগুলিই সারসত্তা যাহাদিগের দ্বারা, ভারতীয়দিগের মতে, দৃষ্টিগ্রাহ্য ও দৃষ্টি বহির্ভূত পৃথিবীর সকল অংশে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

যদিও তাঁহাদিগের এইরূপ ধারণা ইউরোপীয় বুদ্ধিপ্রসূত ধারণা হইতে যথেষ্ট পৃথক, তথাপি, এই চিত্রগুলিতেও, যেইরূপ প্রথম খণ্ডের অন্যান্য অধ্যায়গুলির প্রথম অংশে যথেষ্ট স্পষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে যে, তাঁহারা পবিত্র ত্রিত্বের রহস্য ও ঈশ্বরের অবতার রূপে ঈশ্বরের পুত্রের জন্মগ্রহণ এবং মনুষ্যজাতির আত্মিক নবায়ন স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ধারণারই অনুরূপ কল্পনায়, দুর্গার মহিমান্বিত জয় ও অসুর অর্থাৎ শয়তানের সদলবলে পতন, সমাপ্ত হয় তাঁহাদিগের প্রথম চান্দ্র যুগ।

প্রথম চান্দ্র যুগের পর শুরু হইয়াছিল চান্দ্র পদ্ধতি অনুসারী দ্বিতীয় যুগ, কিন্তু সৌর পদ্ধতি অনুযায়ী ৩৪০৮ বৎসর লইয়া গঠিত দ্বাপর যুগ নামক প্রথম যুগ; এই যুগে সেই প্রাজ্ঞতাস্বরূপা দুর্গাকেই আবার ভারতীয়গণ কল্পনা করিয়াছেন পুরুষ রূপে।

তাঁহারা কী রূপে অদ্যাবধি এই ঈশ্বরের মূর্তি কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা চিত্র সহযোগে এইস্থানে পাঠকদিগের নিমিত্ত প্রদত্ত হইতেছে।

প্রথম সৌরযুগে কিন্তু চান্দ্র পদ্ধতি অনুযায়ী দ্বিতীয় যুগে প্রাজ্ঞতাস্বরূপা দুর্গার চিত্র

চান্দ্র যুগের পরবর্তীকালে প্রথম সৌর যুগকালীন সময়ে সেই প্রাজ্ঞতাস্বরূপা দুর্গাই, যেইরূপ অদ্যাবধি ধারণা

করা হইয়া থাকে, ভারতীয়দিগের দ্বারা কল্পিত হইয়াছিলেন পুরুষ রূপে, সিংহচর্মে আবৃত, সিংহাসনে উপবিষ্ট, দুই নেত্র স্বাভাবিক স্থানে, তৃতীয় নেত্রটি ভ্রূর উপরে, যাহার উপরে চন্দ্রকলা অঙ্কিত; এই বর্ণনাটির সহিত বহুলাংশে মিল রহিয়াছে মস্তকে ত্রিভুজ অঙ্কিত, সগৌরবে সিংহাসনে উপবিষ্ট সাভাওফ* (Seba'oth)-এর বর্ণনার। যাহা হইতে স্পষ্ট যে, প্রাজ্ঞতাস্বরূপা দুর্গা ভারতীয়দিগের নিকট পবিত্র ত্রিত্বের প্রথম দেবতা ভিন্ন অন্য কেহ নহে। (সম্ভবত দেবী দুর্গা ত্রিত্বের প্রথম দেবতা ব্রহ্মার তেজ থেকে আবির্ভূতা বলে—অনুবাদক)

এই চিত্রিত মূর্তিটির কণ্ঠে ঝুলিতেছে ঘণ্টা ও তারকা দিয়া তৈয়ারি চান্দ্রকলা আকৃতির মালা, যাহার অর্থ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সময় ও বৎসরের স্রষ্টা এবং প্রভু।

বক্ষে ও উদরে চিত্রিত তিনটি মুখের অর্থ এই যে, ভারতীয়গণ একেশ্বরে পবিত্র ত্রিত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

এই বিশেষ মূর্তিটিতে তিনি চিত্রিতা ষোড়শভুজা রূপে, প্রতিটি হস্তে বিশেষ বিশেষ প্রতীকী বস্তু, যেইগুলির মধ্যে দক্ষিণ দিকের প্রথম হস্তে তিনি ধরিয়া আছেন হৃদয়, যাহার দ্বারা আপন সৃষ্ট জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম বুঝাইতেছে।
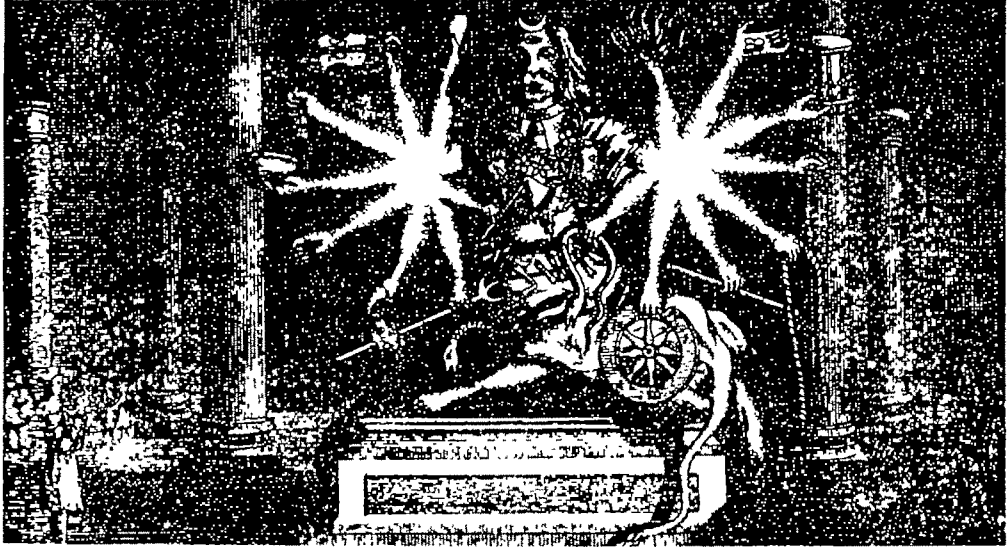
দ্বিতীয় হস্তে তিনি ধরিয়া আছেন বেহালা (?), যেটি, সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর মধ্যে সহমত ও শৃঙ্খলা একমাত্র তাঁহার উপরই নির্ভরশীল ইহার প্রতীক।

তৃতীয় হস্তে ঘণ্টা, যাহা সেই একই অসীম প্রাজ্ঞতাস্বরূপা দুর্গার নিজের সকল প্রকার বিদ্যমানতাকে সময় ধার্য করিয়া দিবার প্রতীক।

চতুর্থ হস্তের গোলাকৃতি পাত্রটির অর্থ আমাদিগের দ্বারা ভোগ্য ও উপলব্ধ সকল প্রকার সুখাদ্য ও মঙ্গলজনক ঘটনার একমাত্র উৎস ও দাতা ঈশ্বর।

পঞ্চম হস্তের শৃঙ্খল সেই একই প্রাজ্ঞতার নিজদিগের মধ্যে পারস্পরিক সহমত ও আমাদিগের সকলকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ের প্রতীক।

ষষ্ঠ হস্তে ধরিয়া থাকা সর্প ও বর্শাদণ্ডে বিদ্ধ নরমুণ্ডটির নিজের চোয়াল হইতে সর্পটির নির্গমনের অর্থ স্রষ্টার প্রাজ্ঞতা তাঁহার সৃষ্ট জীবদিগের ধীশক্তি প্রদত্ত সকল প্রকার প্রাজ্ঞতার বহু উচ্চে এবং তিনি ইচ্ছা করিলে শিশুকে জ্ঞানী ও অহঙ্কারী জ্ঞানী ব্যক্তিকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করিতে পারেন।

তাঁহার দেহের বাম পার্শ্বে প্রথম হস্তে ধৃত অগ্নিশিখা জীব সকলের প্রতি স্রষ্টার অপরিসীম প্রেমের প্রতীক।

দ্বিতীয় হস্তের উন্মুক্ত তালুতে মুদ্রার ন্যায় দেখিতে পাঁচটি বৃত্ত এবং অঙ্গুলিগুলির নিকট থালার দ্বারা দর্শিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের অকৃপণ দান তাঁহার সকল জীবের নিমিত্ত সদাই প্রস্তুত।

তৃতীয় হস্তে ধৃত জাহাজটি, সমুদ্রযাত্রায় পৃথিবীর সকল নাবিকদিগের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য রক্ষাকর্তা যে একমাত্র ঈশ্বরই তাহার প্রতীক।

চতুর্থ হস্তের মুক্তামালার অর্থ মান, যশ, ঐশ্বর্য, মনুষ্যজাতির সমৃদ্ধি সকলই সর্বশক্তিমানের দান।

পঞ্চম হস্তে তিনি ধরিয়া আছেন রজ্জু, যেটির অর্থ জীবের জীবৎকালের দীর্ঘতা ও বাঁচিয়া থাকিবার মেয়াদ নির্ধারণ, নির্দেশ ও পরিমাপ করা কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই শোভা পায়।

ষষ্ঠ হস্তের শাসনদণ্ড একনায়কতন্ত্র বা সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী বুঝায়।

সপ্তম হস্তে তিনি ধরিয়া আছেন তারকাসহ একটি বলয়, যাহার অর্থ সেই অমর খ্যাতি, যাহা ঐশজ্ঞান দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে কতিপয়ের নিমিত্ত ও তিনি আহ্বান করেন সেই নির্বাচিতদিগকে, যাঁহারা তাঁহার বাণী মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন।

অষ্টম হস্তে ধরিয়া আছেন সর্প ও বক্ষের দক্ষিণ দিকে চিত্রিত ত্রিমুখের একটি মূর্তির ওষ্ঠ হইতে নির্গত ক্রুশের আকৃতির ন্যায় বৃক্ষশাখা। পবিত্র ত্রিত্বের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে এই মূর্তিটির উত্থান হইয়াছিল ও কোনও এক কালে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ হেতু পতিত মানবজাতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র ক্রুশ কাঠের দ্বারা মহিমান্বিত করা ছিল ইহার নিয়তির বিধান।

---

* সাভাওফ-ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মে ভগবানের অনেক নামের মধ্যে একটি। বাইবেলের ধাবণা অনুযায়ী, নক্ষত্র ও মহাকাশের অন্যান্য অস্তিত্বগুলোও এক ধরনের যোদ্ধাবাহিনী, তাদের দেবতা সাবাওফ—শক্তির দেবতা।

ভারতীয় জ্ঞানের উৎস বিষয়ক যাহা
সৌর প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রথম সূর্য যুগের এবং চান্দ্র প্রক্রিয়া
অনুযায়ী দ্বিতীয় দ্বাপর যুগের প্রকৃতি হইতে লব্ধ

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

প্রকৃতিরাজ্য বিভাজন বিষয়ক

ভারতীয় হিন্দুগণ বিধাতাসৃষ্ট সসাগরা পৃথিবীকে বিভক্ত করিয়াছেন মুখ্যত চারিটি বিভাগে, যেইগুলির প্রতিটিতে আবার সাতটি করিয়া ঐহিক (অন্তজ) ও কায়িক (জরায়ুজ) জীব, জল, উদ্ভিদ এবং প্রস্তর সংবলিত রাজ্য/জগৎ/লোক রহিয়াছে।

তাঁহাদিগের ধারণায়, অন্যান্য পরিচিত বৃহৎ গ্রহগুলিও আমাদিগের গ্রহের ন্যায় বর্তুলাকার, নিজ অঞ্চলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার খাদ্যসামগ্রীতে বর্ধিষ্ণু, একই প্রকার উচ্চ ও নিম্ন স্তরের আত্মাবিশিষ্ট এবং প্রতিটির এক একটিতে স্থানপ্রাপ্ত জীব, পরমপিতার নিকট হইতে শিষ্টানুযায়ী বা নিয়মানুযায়ী বহুমুখী গুণ লইয়া নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রথম বিভাগ

এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ৭টি রাজ্য, যেইগুলি জীব দ্বারা অধ্যুষিত, যাহার নাম সপ্তসর্ক্য (সপ্তস্বর্গ)*, যেইগুলির মধ্যে—

১ম-ভুব লোক (ভু লোক)-মর্তজাত জীবকুলের রাজ্য যেই স্থান হইতে পুণ্যবানগণ ঊর্ধ্বস্তরে এবং পাপীগণ নিম্নস্তরে তথা পাতালে গমন করিয়া থাকে।

২য়-ভুর লোক (ভুব লোক)-অন্তরিক্ষে বসবাসকারী ঋষিকুলের রাজ্য।

৩য়-সৌর লোক (স্ব লোক)-দেবদূতগণের রাজ্য নামান্তরে **চ্যন** (জন) লোক।

৪র্থ-তপো লোক-প্রধান দেবদূতগণের রাজ্য।

৫ম-ব্রহ্মলোক-দেবশিশুদিগের রাজ্য নামান্তরে **মগর** লোক (মহঃ লোক)।

৬ষ্ঠ-সত্য লোক-দেবসিংহাসনকে ঘিরিয়া থাকা পবিত্র দেবদূতগণের রাজ্য।

৭ম-ধ্রব লোক (ধ্রুব লোক)-একাধিক মস্তক, অগ্নিবর্ষণকারী অক্ষিপুঞ্জ, বহু হস্তবিশিষ্ট শক্তিবর্গ অধিকৃত অগম্য রাজ্য নামান্তরে **অচ্য কুন** (?)।

দ্বিতীয় বিভাগ

এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মহাসাগরের ৭টি রাজ্য, যাহার নাম সপ্তসমুদ্র, যেইগুলি জলজ জীবদিগের দ্বারা পরিপুর্ণ, যেইগুলির মধ্যে—

১ম-লবণ জলের সমুদ্র, নোনা জলের রাজ্য।

২য়-ঔক্ষ্য (ইক্ষু) জলের সমুদ্র, মিষ্ট জলের রাজ্য।

৩য়-সুরা জলের সমুদ্র, সুরা জলের রাজ্য।

৪র্থ-সর্পি জলের সমুদ্র, তৈলাক্ত জলের রাজ্য।

৫ম-দধি জলের সমুদ্র, অম্ল জলের রাজ্য।

৬ষ্ঠ-দুগ্ধ জলের সমুদ্র, দুগ্ধ জলের রাজ্য।

৭ম-সত্য জলের সমুদ্র, পবিত্র জলের রাজ্য।

তৃতীয় বিভাগ

এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ৭টি উদ্ভিদ রাজ্য, যাহার নাম **ক্রৌসের পওধা** গতা (?), যেইগুলির মধ্যে—

১ম-**চম্বু** (জম্বু) দ্বীপ-কাষ্ঠ রাজ্য।

২য়-**পলক্ষ্য** (প্লক্ষ্য) দ্বীপ-লতাগুল্মের রাজ্য।

৩য় - কুশ দ্বীপ-খাদ্যপোযোগী বা খেতে উৎপন্ন আনাজের রাজ্য।

৪র্থ-**ক্রৌস্য** (ক্রৌঞ্চ) দ্বীপ-গম বা ভুট্টাজাতীয় ফসলের রাজ্য।

৫ম-শাক দ্বীপ, গবাদি পশুর খাদ্যোপোযাগী চারণভূমির রাজ্য।

৬ষ্ঠ-পুষ্কর দ্বীপ, পুষ্পোদ্যান বা মিশ্রিত তৃণভূমির রাজ্য।

৭ম-**শাণ মণী** (শাম্মলী) দ্বীপ, রোগ নিরাময়ের ক্ষমতাসম্পন্ন লতাগুল্মের রাজ্য।

চতুর্থ বিভাগ

এই বিভাগে রহিয়াছে ৭টি প্রস্তর রাজ্য, যেইগুলির মধ্যে—

১ম-**পাতল** (পাতাল), দৃশ্যত শিথিল প্রস্তর রাজ্য।

২য়-তল, দৃঢ় প্রস্তর রাজ্য।

৩য়-**তেল অতল** (তলাতল), দানাকৃতি প্রস্তর রাজ্য।

৪র্থ-রসাতল, কর্ণলতিকাকৃতি প্রস্তর রাজ্য।

৫ম-বিতল, পল্লবাকৃতি প্রস্তর রাজ্য।

৬ষ্ঠ-**শতল** (সুতল), একাধিক বর্ণময় প্রস্তর রাজ্য।

৭ম-অতল, স্বচ্ছ প্রস্তর রাজ্য।

---

* সপ্তলোক-ভূঃ, ভূবঃ স্বঃ জন, মহঃ তপ, সত্য।

১৮০৫ সালে প্রকাশিত লেবেদেভের বইতে ছাপা বাংলা শব্দের নমুনা নীচে দেওয়া হল।

ভূৰ লোক

সৌৰ লোক

ধ্রব লোক

ঔক্ষ্য জলের সমুদ্র

সুৰ জলের সমুদ্র

পুস্কৰ

ৰসাতল

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন গ্রহে এবং ডিগ্রিতে/দূরত্বে মহাবিশ্বের বিভাজন লম্বন ক্রিয়াণার্ত্য (লম্বন ক্রিয়নার্থ) বিষয়ক

ভারতীয় হিন্দুগণ, সৌরজগতের ধারায় সারা বিশ্বকে বিভক্ত করিয়াছেন দশটি ডিগ্রিতে বা দূরত্বে, যেইগুলির প্রতিটির একে অন্যের হইতে দূরত্বের নাম **কক্ষ সংস্থান**, যাহা আলোচনার নিমিত্তই প্রদত্ত হইল নিম্নের নকশাটি।
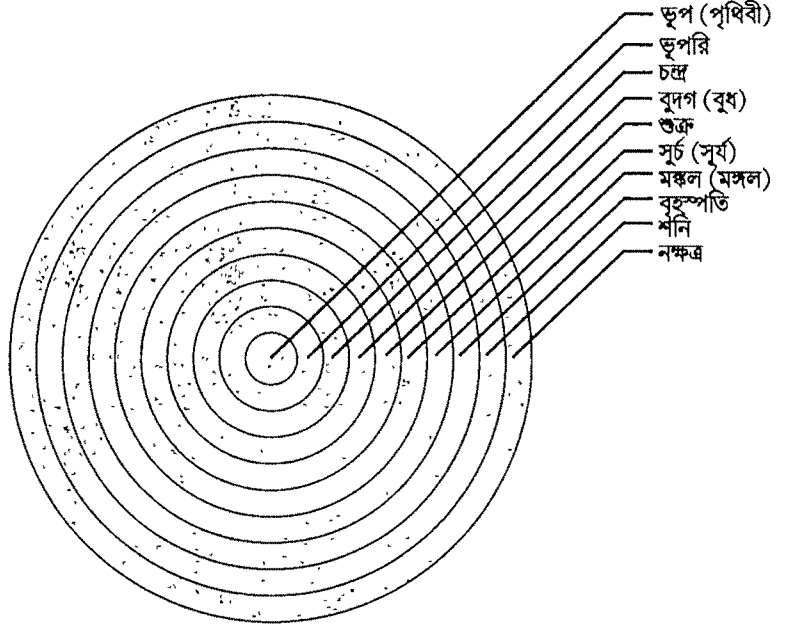
ভারতীয় হিন্দুগণ ১ম বলয়টির কেন্দ্রে কল্পনা করিয়াছেন পৃথিবীকে, যাহার নাম ভূপ।

২য় বলয়টি তাঁহাদিগের ভাষায় ভূপবি, যেইটিতে তাঁহারা স্থান দিয়াছেন নক্ষত্র, গ্রহাদিকে—পিথাগোরাস, উক্ত বলয়টিরই নাম দিয়াছেন **অক্লি** (অগ্নি), কিন্তু ভারতীয় হিন্দুগণ সংযোজন করিয়াছেন যে, ওইটি আলোকবেষ্টিত, অর্থাৎ উহার গঠন ভিন্ন প্রকৃতির।

৩য় বলয়ে তাঁহাদিগের ধারণায় রহিয়াছে সোম বা চন্দ্র;

৪র্থ বলয়ে—বুধ;

৫ম বলয়ে—শুক্র;

৬ষ্ঠ বলয়ে—রবি;

৭ম বলয়ে-**মঙ্কল** (মঙ্গল) অথবা **ভূম**;

৮ম বলয়ে—ইন্দ্র, বৃগস্পতি (বৃহস্পতি);

৯ম বলয়ে—শনি;

১০ম বলয়ে—নক্ষত্র।

ভারতীয় হিন্দুগণ ডিগ্রির নাম দিয়াছেন **চ্যনচ্যন** (যোজন) এবং প্রতিটিকে বিভক্ত করিয়াছেন চারিটি ক্রোশে, সাধারণ মানুষের ভাষায় ইহাই **ক্রোস** (ক্রোশ)।

ভারতীয় হিসাব মতে এক মাইল এক ক্রোশে, ইংরেজি মতে দুই ক্রোশে, ৩৬০ ক্রোশে বা ভারতীয় মাইলে ৬০ ডিগ্রি।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় হিন্দুগণ মনে করেন একটি ডিগ্রি হইতে অন্যটির দূরত্ব ৬ ক্রোশ অথবা মাইল।

একটি ডিগ্রি (দূরত্ব) অন্যটি হইতে ভিন্ন যেই স্থানগুলির দ্বারা, তাহা নিম্নলিখিত (দশদিকপালের) নামগুলির দ্বারা ভারতীয় হিন্দুদিগের নিকট সূচিত:

১ম-**ইন্দ্র পূর্ব দিক** (ইন্দ্র-পূর্ব কোণ), **বৃহস্পতির পূর্ব দিক**।

২য়-**অক্নি দিক** (অগ্নি-আগ্নিকোণ), **অগ্নির দিক**।

৩য়-**পিতৃ দিক** (নিঋত-নৈঋত কোণ), **প্রীতিপূর্ণ দিক**।

৪র্থ-**লৌধ্যর্ত দিক** (যম-দক্ষিণ দিক), **দক্ষিণ দিক**।

৫ম-**বরিয়ান দিক** (বরুণ-পশ্চিম কোণ), **নেপচুন দিক**।

৬ষ্ঠ-**মরত দিক** (মরুৎ-বায়ুকোণ), **মনুষ্যগণের দিক**।

৭ম-**কুরের দিক** (কুবের-উত্তর দিক), **পশুদিগের দিক**।

৮ম-**ঈশ দিক** (ঈশ-ঈশানকোণ), **ধার্মিকগণের দিক**।

৯ম-**উদর্গব্রগ্ম দিক** (ব্রহ্মা-ঊর্ধ্ব দিক), **ঐশ্বরিক দিক**।

১০ম-**অন্ত দিক** (অনন্ত-অধোদিক), **পশ্চিম দিক**।

এই কারণেই সম্ভবত শেষটি, ইউরোপীয়দিগের ধারণাতেও বলয়ের উপর মধ্যরেখা নামক একটি রেখা, যেটি প্রতি দশ ডিগ্রির ব্যবধানে ৩৬টি সমান অংশে বিভাজনযোগ্য।

লেবেদেভ তাঁর রচনায় বিভিন্ন গ্রহ ও দিকের নাম যেভাবে লিখেছিলেন—

বুধ সুক্র ৰবি মণগলো বৃহসপতি শণি নক্ষত্র

তৃতীয় অধ্যায়
অন্তরিক্ষের জ্যোতিষ্কমণ্ডল বিষয়ক

যদিও এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে অন্তরিক্ষের জ্যোতিষ্কমণ্ডলের উল্লেখ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই স্থানে উহার উল্লেখ করিয়াছিলাম কেবলমাত্র জীব সৃষ্টির ক্রমিক নিয়ম এবং উক্ত প্রথম চান্দ্র পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, এই অধ্যায়ে উক্ত নিয়মের ফলে সঙ্ঘটিত পরবর্তী পরিবর্তন ও ক্রিয়াগুলি এবং বিশেষত উহাদের বিভাজনের বিষয়টি উল্লেখের প্রয়োজন।

অন্তরিক্ষের জ্যোতিষ্কমণ্ডল, কল্পিত গ্রহণ রেখার (আকাশে সূর্যের পরিক্রমণ পথ) **কেনদেব**-এ (কেন্দ্রে) থাকিয়া, ভারতীয় চান্দ্র-সৌর পদ্ধতির সহিত যুক্ত অবস্থায় তিনটি মুখ্য বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে: **ক্রগর** (গ্রহ), সন্ধ্যাকালীন নক্ষত্ররাজি **নাচাত্রা তারি** ও প্রভাতকালীন নক্ষত্ররাজি **বরকনের তারি**।

প্রথম বিভাগে যেই গ্রহগুলি রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়, সেইগুলির মধ্যে—

১ম গ্রহ-সংস্কৃত ভাষায় সূর্য ও বাংলা ভাষায় রবি, ভাষান্তরে **সূর্চ**, নামান্তরে **দিবাকরণ**, আদিত্য, **অশস্কব** (তেজস্কর), **পূষণ** (পূষা), অরুণ, **বীরধন্য**, **দূয়াদশ** (দ্বাদশ), ভাস্কর, **অর্চমান** (অর্চিমান), মার্তণ্ড। সূর্যের এই ১২টি উপরোক্ত নাম ব্যতিরেকে মিশ্র উপভাষায় ইহার নাম এতবার্ অর্থাৎ রবিবার।

সংস্কৃত বা বাংলায় রবিদিন বা রবি বার অর্থাৎ সূর্যের দিন।

২য় গ্রহ-চন্দ্র, সংস্কৃত ভাষায় সোমঃ বা বাংলায় সোম, নামান্তরে চন্দ্র, এবং কথ্য ভাষায় চন্দ বা চাঁদ, **মোগাতব**, **কালানিধি** (কলানিধি), **উরূপ** (অরূপ), **কেপাকব** (ক্ষেপাকর)।

প্রদত্ত চন্দ্রের ছয়টি সমার্থক ব্যতিরেকে ভারতীয় মিশ্র উপভাষায় উহার নাম পীব, এবং সংস্কৃত ও বাংলায় সোমবার, এবং কথ্য ভাষায় **সোমবেব**।

৩য় গ্রহ-সংস্কৃত ভাষায় **মঙ্কল**, ভৌম, **লগিতানো**, **কুচতো**, **অঙ্কাকব** (অঙ্কার), বাংলা ও মিশ্র উপভাষায় **মঙ্কল**, **ভৌম** বা **ভুম**, **মঙ্কল দিন** বা **মঙ্কল বাব** (মঙ্গল)।

৪র্থ গ্রহ-সংস্কৃত ভাষায় বুদগ, বাংলায় বুধ, নামান্তরে **সৌম্যেয় বা রৌগিনেয়** (রোহিণী)।

বদ্গ বার বা বুধবার অর্থাৎ বুধের দিন, মিশ্র উপভাষায় চার সম্বে (সন্ধে), অর্থাৎ অর্ধ সপ্তাহ এবং রুশ ভাষায় বুধবার "স্রিদা", যাহার ব্যুৎপত্তি "সেংরদা" শব্দ হইতে, যাহার অর্থ মধ্য।

৫ম গ্রহ-সংস্কৃত ভাষায় ইন্দ্র, **কগরু** (গুরু), কেশপতি, দেগাশন, সুরা চার্চ্য (সুরাচার্য), **চিবো**, **বৃগসপতি** (বৃহস্পতি), বাংলায় বৃগসপত, চিব (জীব), দেগশন। ইন্দ্র, ভারতীয়দিগের নিকট সমৃদ্ধিদায়ক এবং কল্যাণসূচক।

বৃগসপতি বার বা **লক্ষি** (লক্ষ্মী বার) অর্থাৎ ইন্দ্র বার। মিশ্র উপভাষায় **চম্বারস** যাহা রুশ ভাষায় "চিতভেরগ্"।

৬ষ্ঠ গ্রহ-সংস্কৃত ভাষায় শুক্র, **কাব্যেয**, **উষানা**, ভার্কব (ভার্গব), কবি, দত্ত্য কগ্রু (দৈত্যগুরু), বাংলায় **শুকব**, **কাব**, **উষান**, **ভার্কব** (ভার্গব)।

শুক্রবার বা **শুক্র বেব** অর্থাৎ শুক্রর দিন, মিশ্র উপভাষায় **চোম্মা** বা **চুম্মা** (জুম্মা) অর্থাৎ শুক্রবার।

৭ম গ্রহ-সংস্কৃত ভাষায় শনি, বাংলায় **শন**।

শনিবার বা **শন** বার অর্থাৎ শনির দিন, মিশ্র ভাষায় **শনিচেব** বা **শানিচের** (শনৈশ্চর), রুশ ভাষায় "সুব্বতা"।

৮ম গ্রহ-রাহুই হইল পূর্বোল্লিখিত **শনিশ**, যাহার প্রভাবে পৃথিবীতে চন্দ্রপ্রবাহ প্রেরিত হইয়া থাকে।

৯ম গ্রহ-কেতুই হইল পূর্বোল্লিখিত **সৌরি**, যাহার প্রভাবে পৃথিবীতে সূর্যপ্রবাহ প্রেরিত হইয়া থাকে।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতীয় হিন্দুগণ প্রথম চান্দ্র যুগে রাহু ও কেতুকে জটিল গ্রহ হিসাবে গণ্য করিতেন। কোনও একসময়ে আকাশে বিদ্রোহ, যাহা সম্পর্কে পূর্বে বলা হইয়াছে, সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, এই কথাটি স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা সর্বদা আতঙ্কিত হইয়া পড়িতেন।

উপরোউক্ত বক্তব্যের পরিশিষ্ট হিসাবে ভারতীয় হিন্দুদিগের দ্বারা কল্পিত তিনটি বিশেষ বলয়ের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যেইগুলি, তাহাদিগের মতে, ওই অবস্থাতেই পরিক্রমণ করিয়া থাকে।

১ম-**ভূপাদগব** নামক পৃথিবীর বলয়, যাহার মধ্যরেখা বরাবর সুমেরু পর্বত অবস্থিত।

২য়-চন্দ্র কক্ষ নামক চন্দ্র বলয়, দু'টি ক্ষুদ্র বলয় দ্বারা নিম্নে দর্শানো চন্দ্র প্রবাহ।

৩য়-চন্দ্র কক্ষ নামক সূর্য বলয় বা **সূর্য বিম্ব**, উহার ক্ষুদ্র বলয়গুলির মাধ্যমে সূর্যের প্রবাহ দর্শানো হয়।

এই গ্রহগুলির প্রতিটি কত সময় ধরিয়া নিজ পরিক্রমণ সম্পন্ন করিয়া থাকে, যাহার নাম **সিংহাসন**, জ্যোতির্বিদগণ তাহা জ্যোতির্বিজ্ঞানের নকশায় দেখিতে পান।
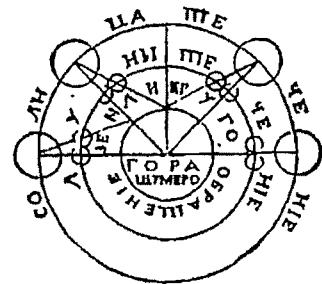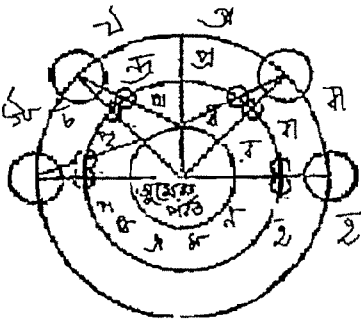
বিভিন্ন গ্রহের সেই বলয়গুলির উল্লেখ এই ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হইয়াছে, সেইগুলিকে একই রূপে বুঝিতে হইবে।

অন্যরূপ পরিক্রমণ ভারতীয় হিন্দু পঞ্জিকায় আলাদা করিয়া মাসিক বলয় হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সাধারণভাবে সমস্ত গ্রহ ও নক্ষত্রের বিভিন্ন গতি ও স্থান পরিবর্তনও কম লক্ষণীয় বিষয় নয়। যথা:

১ম-মধ্য, সম গতি, ২য়-বক্র বা **বকর,** অসম গতি, ৩য়-**শীক্র** (শীঘ্র) গতি, ৪র্থ-মন্থর গতি, যাহার ভিত্তিতে ভারতীয় হিন্দুদিগের দিবারাত্র মিলিয়া একদিনে ২৪ ঘণ্টা, কিন্তু কোনও এক বিশেষ জ্যোতির্গণনা অনুযায়ী ৬০ ঘণ্টা, যাহা নিম্নপ্রদত্ত পঞ্জিকার নকশায় দৃশ্যমান।

এই ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত **নচাত্রা বা নাচাত্রা তারি** নামক ২৭টি রাত্রিকালীন নক্ষত্রের নাম (আরাধ্য দেবদেবীর নাম ও অর্থসহ) নিম্নে প্রদত্ত হইল, যাহাদের মধ্যে—

১ম-অসনী, নামান্তরে অশ্বিনী বা আশ্বিনী, যাহার অর্থ মেয়ে ঘোড়া বা ঘুড়ী।

২য়-**ভরনি** (ভরণি), মৃত্যু (যম, মৃত্যুর দেবতা)।

৩য়-**কির্ত্তিকা** (কৃত্তিকা), অগ্নি।

৪র্থ-**রহিনী** (রোহিণী), **ব্রহ্মার স্ত্রী** (ব্রহ্মা বা প্রজাপতি)।

৫ম-**স্মৃগসিরা/মৃকশিরা** (মৃগশীর্ষ), **চন্দ্রকলার স্ত্রী**।

৬ষ্ঠ-**আরদ্র** (আদ্রা), তীর।

৭ম-**পূর্ণব বসু** (পুনর্বসু), **শয়তানের স্ত্রী** (?), (অদিতি, দেবগণের মাতা), (সম্ভবত লেখক অদিতির পরিবর্তে দিতি নামটির অর্থ দৈত্যদের জননী হিসাবে শয়তানের স্ত্রী লিখেছেন—অনুবাদক)।

৮ম-পুস্য (পুষ্য) বা পুষা, বৃহস্পতি।

৯ম-**অশলেসা** (অশ্লেষা), সর্প।

১০ম-**মক্ষ** (মঘা), **মঙ্গলদায়ক** (পিতৃপুরুষ)।

১১শ-**পুর্ব ফলগনী** (পূর্ব ফাল্গুনী), কথ্য ভাষায় **ফল্কুণী, পুর্বদেশের প্রাচুর্যের উৎস** (ভগ, পার্থিব সম্পদের দেবতা)।

১২শ-**উত্তর ফলগনী** (উত্তর ফাল্গুনী), **উত্তরের নক্ষত্র** (অর্যমণ)।

১৩শ- **হস্তা, পৃথিবীতে সূর্যের প্রকাশ**।

১৪শ-**চিত্রা, বায়বীয়া বা সৌন্দর্য** (বিশ্বকর্মা)।

১৫শ-**স্যুতি** (স্বাতী), **বায়বীয় বা পৌরুষ** (বায়ু, বায়ুদেবতা)।

১৬শ-**বিসোকা** (বিশাখা), **ব্রাহ্মণীর প্রকাশ** (ইন্দ্র, অগ্নি)।

১৭শ-অনু রাধা, **নামান্তরে অন্যরাধা, দেবগণের** মাতা (মিত্র)।

১৮শ-**জেস্তা** (জ্যেষ্ঠা), **বৃহস্পতির প্রকাশ** (ইন্দ্র)।

১৯শ-মূলা (মূলা), **উত্তর ও পশ্চিম কোণের স্ত্রী বা মূল** (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ)।

২০শ-**পূর্ব** সারা (পূর্বাষাঢ়া), **পূর্বদিকের জল** (অপ, জল দেবতা)।

২১তি-**উত্তরা সারা** (উত্তরাষাঢ়া), **উত্তরের** জল (বিশ্বদেব)।

২২তি-**শরাবণা** (শ্রবণা), **বৃহস্পতির স্ত্রীর প্রকাশ** (বিষ্ণু), এই নক্ষত্রকে ধরিয়া আলাদা বর্ষ গণনা করা হইয়া থাকে।

২৩তি-**ধণিস্তা** (ধনিষ্ঠা), **সম্পদ** (বাসু, পার্থিব সম্পদের দেবতা)।

২৪তি-**শত ভিসা** (শতভিষক), **শৌর্য** (বরুণ, জল, স্থল এবং অন্তরিক্ষের দেবতা)।

২৫তি-পূর্ব ভাদ্র পদ, পূর্ব নক্ষত্রের পথ।

২৬তি-**উত্তর ভাদ্র পদ, উত্তর নক্ষত্রের পথ**।

২৭তি-রেবতী বা **রাবতী**, কথ্য ভাষায় পার্বতী, কৃষিদেবতার স্ত্রী, যিনি ভারতীয় হিন্দুগণের নিকট নামান্তরে বলরামা, যাঁহার স্বামী **বলরাম**, এবং উভয়ই কৃষিকার্যের পৃষ্ঠপোষক দেবতা হিসাবে পূজনীয়।

রেবতী বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থে **তাবতী** (তপতী) নামে সম্বোধিতা, এবং সম্ভবত পুরাকালে ইন্দ্রের সহিত তিনিও নিজ জাতির প্রতিষ্ঠাত্রী হিসাবে পূজিত হইতেন, যাহার উল্লেখ রহিয়াছে মহারাজ শেরবাতভের* ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকার ১৩ নং পাতায়।

মিখাইল পাপোভের** রচনাবলির ২৫ নং পাতায় স্লাভ রূপকথার ক্ষুদ্র বর্ণনায় ভারতীয় হিন্দু নাম শিভার (শিব) পরিবর্তে তিনি কিয়েভের দেবতাদিগের মধ্যে স্লাভদিগের দ্বারা বর্ণিত সিবা, সিভা বা সেভা নাম উল্লেখ করেন, যাহার অর্থ পৃথিবীর মাটি হইতে যাহা কিছু অঙ্কুরিত/উদ্গত হয়, তাহার দেবী বা মালকিন।

এই অধ্যায়ের তৃতীয় ভাগে রহিয়াছে ভারতীয় হিন্দুগণের **বরকনের তারি** নামক ২৭টি প্রভাতের নক্ষত্র, কথ্য ভাষায় যাহা **প্রভাতের তারি** নামান্তরে চকা (যোগ), যাহাদিগের মধ্যে—

১ম-**বিশকুম্ভ চক** (বিষকুম্ভ যোগ), অর্থাৎ কল্যাণকর/মঙ্গলকর/শুভ (?) প্রভাতের নক্ষত্র।

২য়-প্রীত (প্রীতি)-**বন্ধু**।

৩য়-আয়ুসুয়াণ (আয়ুশ্মান)- **যৌবন, সৎ যুবক**।

৪র্থ-সৌভাগ্য-**সুন্দরী, সৌন্দর্য**।

৫ম-সোভণ (শোভন)-**পরম সুখ, সমৃদ্ধি**।

৬ষ্ঠ-**অতি গন্ত** (অতিগন্ড)-**বৃহৎ ধূপ** (?)।

৭ম-সুকর্ম বা সরাসিতি (সুকর্মা)-স্বাচ্ছন্দ্য, সুসময়।

৮ম-ধৃতি - ধারাস্রোত।

৯ম-সুল (শূল) বা পাণি-জল (?) (সম্ভবত লেখক খেয়াল করেননি যে, শব্দটির আরেকটি অর্থ হয় "হাত"—অনুবাদক)

১০ম-গন্ত, ক্যন্দ (গন্ড)-গন্ধ (?)।

১১ম-বরীদ্ধি (বৃদ্ধি)-পরমোৎকর্ষ, বার্ধক্য, চন্দ্রক্ষয়।

১২ম-দ্রব (ধ্রুব)-বিভিন্নতা, দূরত্ব।

১৩ম-ব্যগহাত (ব্যাঘাত)-ম্রিয়মাণ, জরাগ্রস্ততা।

১৪ম-হর্সণ (হর্ষণ)-প্রভুত্ব।

১৫ম-বচরো (বজ্র)-বাছুর (?) (সম্ভবত লেখক উচ্চারণে মিলের কারণে বচরো শব্দটির অর্থ বাছুর ভেবেছেন-অনুবাদক)

১৬ম-সৃক (অসৃক)-তিনটি নক্ষত্রের মিলন, যাহার ভিত্তিতে ভারতীয় হিন্দুগণ গণনা করিয়া থাকেন।

১৭ম-ব্যতিপাত-বিযুক্তি।

১৮ম-বারীআণ (বরীয়াণ)-উত্তরের হাওয়া।

১৯ম-পরি (পরিঘ)-ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা, প্রবাহ।

২০ম-সিব (শিব)-ত্রিরূপের নবীকার।

২১ম-সিদ্ধি (সিদ্ধ)-সন্ধ্যা।

২২ম-সাদ্ধি (সাধ্য)-মধ্যরাত্রি।

২৩ম-সুভ (শুভ)-আনন্দিত হওয়া, দয়া।

২৪ম-শুকব (শুক্র বা শুক্ল)-মূল।

২৫ম-ব্রাহ্ম (ব্রহ্ম), প্রথম সৃষ্ট মানুষের নাম।

২৬ম-ঈন্দর (ইন্দ্র), মহেন্দ্র, বৃহস্পতি।

২৭ম-বৌধৃতি (বৈধৃতি), মুশলধারায় বৃষ্টি।

ইহাতেই সমাপ্ত হইল নক্ষত্র ও গ্রহরাজির তিনটি বিভাগ।

ইহা ব্যতীত, উহারা অস্থির নাচাত্রা তাবি ও স্থির পারার প্রেক -এ বিভক্ত। অস্থির বলা হইয়া থাকে, সেইগুলিকে যেইগুলি তাহাদের নির্দিষ্ট বলয়ে পরিক্রমণ সম্পন্ন করিয়া থাকে এবং স্থির সেইগুলি, যেইগুলি তাহাদের স্থান পরিবর্তন করে না।

সমস্ত মন্তব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত দেবতাগণের উপর ভিত্তি করিয়া নক্ষত্ররাজির মধ্যে কয়েকটি পুরুষজাতির এবং অন্যগুলি স্ত্রী জাতির বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, যেইগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচিত হইবে।

---

* শেরবাতভ ম.ম. (১৭৩৩-১৭৯০)—"প্রাচীনকাল হইতে রাশিয়ার ইতিহাস" বইটির লেখক। বইটি সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে ১৭৭০-১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

** পাপোভ ম.ব. (১৭৪২-আনুমানিক ১৭৯০)—১৭৬৮ সালে প্রকাশিত "প্রাচীন পৌত্তলিক স্লাভ জাতির উপকথার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা" নামক বইটির লেখক।

লেবেদেভ তাঁর রচনায় নক্ষত্র ও যোগের নাম যেভাবে লিখেছিলেন—

অসনী ভৰনি কির্ত্তিকা ৰহিনী স্মৃগসিবা আৰদ্র পুর্ণব বসু পূস্য অশলেসা মক্ষ পুর্ব ফলগনী উত্তৰ ফলগনী হস্তা চিত্রা সুাতি বিসোকা অনু ৰাধা জেস্তা ম্মলা পূর্ব সাৰা উত্তর সাৰা শৰাবণা ধণিস্তা শত ভিসা পূর্ব ভাদ্র পদ উত্তৰ ভাদ্র পদ ৰেবতি বিশকুম্ভ প্রীত অযুসুাণ সৌভাগ্য সোভণ অতি গন্ত্য সুকর্ম্ম ধৃতি সুল গন্ত ৰবীদ্ধি দ্রব ব্যগহাত হর্সণ বচৰো সৃক ব্যতিপাত বাৰীাণ পডি সিব সিদ্ধি সাদ্ধি সুভ শুকৰ ব্রাক্ষ ঈন্দৰ বৌধৃতি

চতুর্থ অধ্যায়

মাস, চিহ্ন এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাদি বিষয়ক

ভারতীয় হিন্দুদিগেরও মাসের সংখ্যা আমাদিগের ন্যায় ১ বৎসরে ১২টি। পার্থক্য কেবল এই যে, মাসগুলির মধ্যে একটিতে ৩২ দিন, তিনটি মাস ২৯ দিন ও অন্যগুলি ৩০ অথবা ৩১ দিন করিয়া। ভারতীয় হিন্দু ক্যালেন্ডারে মাসগুলির নাম—

১ম-**বৌশাক** (বৈশাখ) মাসে ৩১ দিন, ইহার চিহ্ন (রাশি) মেষ।

২য়-**জৌশঠ্** (জ্যৈষ্ঠ), কথ্য ভাষায় চৈষ্টি মাসে ৩১ দিন, চিহ্ন বৃষ বা **ব্রেষ**।

৩য়-**আসাই** অথবা আষাঢ়, কথ্য ভাষায় **আসুর** অথবা আষাঢ় মাসে ৩২ দিন, চিহ্ন **মিতুণ** (মিথুন)।

৪র্থ-**শরাবণ** (শ্রাবণ), কথ্য ভাষায় শাওন মাসে ৩১ দিন, চিহ্ন কর্কট।

৫ম-**ভাদরো** (ভাদ্র), কথ্য ভাষায় ভাদুর মাসে ৩১ দিন, চিহ্ন সিংহ।

৬ষ্ঠ-আশ্বিন, কথ্য ভাষায় আসিন মাসে ৩১ দিন, চিহ্ন **কণ্য** বা কণে (কন্যা), যাহার অর্থ অবিবাহিতা বালিকা।

৭ম-কার্তিক, কথ্য ভাষায় কাতেক মাসে ৩০ দিন, চিহ্ন তুলা।

৮ম-**অগরাহোএণ** (অগ্রহায়ণ), কথ্য ভাষায় **আকগণ** মাসে ২৯ দিন, চিহ্ন বিচা (বৃশ্চিক)।

৯ম-পৌষ, কথ্য ভাষায় পৌস মাসে ২৯ দিন, চিহ্ন ধনু।

১০ম-**মাগহ** (মাঘ), কথ্য ভাষায় মাক মাসে ২৯ দিন, চিহ্ন মকর (সামুদ্রিক জন্তু)।

১১শ-**ফালগরণ** (ফাল্গুন), কথ্য ভাষায় ফাকগন মাসে ৩০ দিন, চিহ্ন কুমভ (কুম্ভ), ভারতীয় ভাষায় যাহার অর্থ কলস।

১২শ-**চৌত্র** (চৈত্র), কথ্য ভাষায় চৈত মাসে ৩০ দিন, চিহ্ন মীণ (মীন)। মীন শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, মিশ্র উপভাষায় তাহা মাচি, যাহার অর্থ মৎস্য বা মাছ।

মাসগুলির চিহ্নসকল অর্থাৎ রাশিচক্র আমাদিগের ন্যায়ই উত্তরের ও দক্ষিণের রাশিতে বিভক্ত। উপরি উল্লিখিত ১২টি মাস জ্যোতির্বিদ্যা এবং স্বাভাবিক হিসাবানুযায়ী দিনের দীর্ঘতায় বা হ্রস্বতায় কয়েক ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড করিয়া বেশি বা কম হইয়া প্রতি বৎসরে ৩৬৫ দিন হয় এবং প্রতি বৎসর কয়েকটি মাসে একটি হইতে অন্যটিতে একটি করিয়া তারিখ স্থানান্তরিত হইয়া থাকে।

এই ১২ মাস লইয়া গঠিত বৎসরকে ভারতীয় হিন্দুগণ চারিভাবে গণনা করেন।

১ম চন্দের মাস অথবা নাচাত্র দিন নামক গণনা—চন্দ্র প্রবাহ অনুসারী, অর্থাৎ চাঁদের মাস।

২য়-সৌরের মাস অথবা সৌরের মেইনা (মাহিনা) নামক গণনা—সম ও অসম, ধীর ও দ্রুত সৌর পরিক্রমণ অনুসারী, অর্থাৎ সূর্যের মাস।
৩য়-শ্রাবণের মাস বা শ্রাবণের মেইনা নামক গণনা—৩০ দিনের মাসগুলিতে সূর্যের পরিবর্তন অনুসারী, যেই মাসগুলিতে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের দীর্ঘতা ধরা হইয়া থাকে।
৪র্থ-নক্ষত্রর মাস বা নক্ষত্রর মেইনা নামক গণনা—২৭টি নক্ষত্র অনুসারী, অর্থাৎ নক্ষত্রর মাস।
এইগুলি **মনন তরা** (মন্বন্তর)* নামক সেই গণনাপদ্ধতি, যাহার কিছুটা উল্লেখ প্রথম ভাগে করা হইয়াছে।
ভারতীয় হিন্দুগণ মনে করেন এক বৎসরে এই ১২ মাসের মধ্যেই ছয়টি কালের পরিবর্তন ঘটে, যাহার নাম **চয় ঋতু** (ছয় ঋতু) বা কাল ঋতু, যেগুলির প্রতিটির জন্য দুইটি করিয়া মাস ধার্য, উদাহরণস্বরূপ—
১ম-**বসণত** (বসন্ত) ঋতু বা বসন্তকাল, বসন্তের সময়।
২য়-**গ্রীস্য** (গ্রীষ্ম) ঋতু বা গ্রীষ্ম কাল, গরমের সময়।
৩য়-**বরিস** (বর্ষা) ঋতু বা বর্ষাকাল, বৃষ্টির সময়।
৪র্থ-**সরত** (শরৎ) ঋতু বা শরতকাল, নির্মল আকাশ এবং সুখদায়ক সময়।
৫ম-**সিশীর** (শিশির) ঋতু বা শিশিরকাল, শিশিরপাতের সময়।
৬ষ্ঠ-হিম ঋতু বা শীতু (শীত) কাল, কুয়াশা ও ঠান্ডার পারস্পরিক পরিবর্তনের সময়।
ভারতীয় হিন্দুগণ উক্ত ছয়টি কাল পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত ৬ জন রাকগা (রাগ) ও ৩৬ জন রাকগিনী (রাগিণী) নামক ধার্মিক, অদৃশ্য, পুরুষ ও স্ত্রীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যাহাদিগের সম্মানার্থে ভারতীয় হিন্দুগণের রচিত বহুবিধ লোকগীতি ও ভক্তিগীতি স্থান পাইয়াছে তাঁহাদিগের মাসের পুথি, নামান্তরে **মেইনার কেতাব** বা মাহিনার আর্চা নামক মাসিক গ্রন্থাদিতে।

---

* মন্বন্তর-মন্বন্তর শব্দের অর্থ মনুর কাল। ১৪টি মন্বন্তরে একটি কল্প হয় এবং এই এক কল্পকাল ব্রহ্মার একটি দিন। এই একদিনেব মধ্যেই ক্রমান্বয়ে চতুর্দশ মনুর অধিকারকাল শেষ হয়। এক মনুর অধিকারকাল শেষ হলে আর এক মনুর অধিকারকাল আরম্ভ হয়। এক এক মনুর রাজত্বকালকে মন্বন্তর বলে। মনুদের নিজেদের নাম অনুসারে চতুর্দশটি বিভিন্ন নাম হয়েছে। এই ১৪টি মন্বন্তরের প্রত্যেক মন্বন্তরে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতার, একেকজন ইন্দ্র, পৃথক পৃথক দেবতারা, সপ্তর্ষি, মনু ও মনু পুত্ররা আবির্ভূত হন। (পৌরাণিক অভিধান/ শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার)।

লেবেদেভ তাঁর রচনায় মাস, রাশি ও ঋতুর নাম যেভাবে লিখেছিলেন—

বোশাক	ভাদৰো	পৌষ
মেষ	সিংহ	ধনু
জ্যৌশঠ	আশ্বিণ	মাগহ
বৃষ	কণ্যা	
		বসণত ঋতু
আসার্হ	কার্তিক	গ্রীস্য ঋতু
মিতুণ	তুলা	বৰিস ঋতু
		সবত ঋতু
শৰাবণ	অগৰাহোএণ	সিশীৰ ঋতু
কর্কট	বিচা	হিম ঋতু

পঞ্চম অধ্যায়

পাঁচি (পাঁজি) নামক ভারতীয় হিন্দু ক্যালেন্ডারের/ পঞ্জিকার সারণিগুলির নকশা ও সূত্র বিষয়ক

সূত্র এই স্থানে বৃত্তের সেই নকশাটি যেটি ভারতীয় হিন্দুগণ প্রতিটি মাসের পূর্বে তৈয়ারি করিতেন এবং যেটিতে তাঁহারা দেখাইতেন: ১) মাসগুলি কোন কোন গ্রহ এবং নক্ষত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ২) ওইগুলি একে অপর হইতে কত দূরে অবস্থিত।

বৃত্তটির বাম দিকের উপরে বর্তমান মাসের নাম, উহার প্রথম তারিখ, কত ঘণ্টা ও মিনিটে চন্দ্রের এবং সূর্যের প্রবাহ অনুযায়ী দিন শুরু হইবে তাহা লিখা থাকিত।

বৃত্তটির ডান দিকের উপরে সংক্ষিপ্তাকারে অক্ষরের মাধ্যমে সেই মাসগুলিকে নিয়ন্ত্রণকারী গ্রহগুলির নাম এবং কতিপয় গ্রহের সহিত সংযুক্ত নক্ষত্রগুলির নাম সংখ্যার মাধ্যমে লিখা থাকিত।

১২টি প্রকোষ্ঠ লইয়া গঠিত উক্ত বৃত্তটির মধ্যস্থলে লিখা থাকিত বছরের প্রথম মাসে নিয়ন্ত্রণকারী গ্রহ ও নক্ষত্রগুলির স্থান এবং সেই সময় একটি অপরটি হইতে কত দূরত্বে অবস্থান করিতেছিল, যথা—যখন বর্তমান বৎসরের প্রথম মাস বর্ণিত হয়, তখন ১২ ভাগে বিভক্ত বৃত্তের উপরে, মধ্যে, প্রথম ঘরে সূর্যকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে একত্রে নিয়ন্ত্রণকারী দুইটি গ্রহ ও নক্ষত্র সমেত। সূর্য চিহ্নিত করা হয় বর্ণমালার "র" অক্ষর দ্বারা, অর্থাৎ রবি। শুক্র চিহ্নিত করা হয় যুক্তাক্ষর "শু", শনি চিহ্নিত হইয়া থাকে "শ" অক্ষরের দ্বারা। অশ্বিনী অর্থাৎ মেয়ে ঘোড়া নামক প্রথম সন্ধ্যাকালীন নক্ষত্র চিহ্নিত করা হয় ১ সংখ্যা এবং সংখ্যাটির পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে উহার অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় সন্ধ্যাকালীন নক্ষত্র ভরণী, যাহার অর্থ মৃত্যু, চিহ্নিত করা হয় ২ সংখ্যা দ্বারা।

ইহার তিনটি ঘর পরে চন্দ্রকে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে নক্ষত্র বা ক্ষুদ্র গ্রহ রাহুর সহিত, যেইটির মাধ্যমে ভারতীয়গণ চন্দ্র পরিক্রমণ গণনা করেন, ইহার পর একটি ঘর ছাড়িয়া মঙ্গল চিহ্নিত করা হয় ১৬ সংখ্যা দ্বারা, পরবর্তী বুধ চিহ্নিত হয় ১৯ সংখ্যা দ্বারা, ইহার পর একটি ঘর ছাড়িয়া দিয়া কেতু নক্ষত্র বা গ্রহের স্থান চিহ্নিত হয় ২৩ সংখ্যা দ্বারা, বৃহস্পতি চিহ্নিত হয় ২৯ সংখ্যা দ্বারা, ইহাদের পরিক্রমণ ভারতীয়দের মতে শুরু হয় ডান দিক হইতে বাম দিকে।

ভারতীয় এই ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা বুঝিবার জন্য সারণিগুলির একত্রীকরণে গুরুত্ব প্রদান কম প্রয়োজনীয়

নয়, যেইগুলির মধ্যে প্রথমটি, যেইটি অকৃত্রিম ভারতীয় সেইটি উপরে বাম হাত হইতে ডান হাতের দিকে তিনটি ঘরে, উপর হইতে নীচের দিক বরাবর অক্ষর এবং সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত চারিটি করিয়া ঘরে বর্ণিত, যেইগুলির দ্বারা ওই ঘরগুলির প্রথম স্থানের উপরে দিন কেবল সংক্ষেপে "ড" অক্ষরের দ্বারা দর্শিত হইয়াছে, ৬ সংখ্যা দ্বারা বারের ক্রম অনুযায়ী সপ্তাহের ঠিক কোন দিন বুঝানো হইয়াছে।

সপ্তাহের দিন যে সারিতে চিহ্নিত, সেই সারিতেই তাহার নীচে ১১ সংখ্যার দ্বারা দেখানো হইয়াছে চন্দ্রের পরিক্রমণ অনুযায়ী ঠিক কোন দিন।

তাহার পর তৃতীয় স্থানে ৪ সংখ্যা ঘণ্টার চিহ্ন এবং তাহার নীচে চতুর্থ স্থানে ৪৩ সংখ্যা মিনিটের চিহ্ন লিখিয়া চন্দ্রোদয়ের সময় বুঝানো হয়।

এই সারণির দ্বিতীয় সারির প্রথম স্থানে ১০ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়া থাকে সন্ধ্যাকালীন নক্ষত্র "ড°" লেখা অক্ষর সমেত, যাহার অর্থ এক্ষেত্রে দিন নহে, বরং উহা ঘণ্টা বা দণ্ড।

নক্ষত্রের নীচে দ্বিতীয় স্থানে চিহ্নিত করা হয় চন্দ্রোদয়ের সময়।

তৃতীয় স্থানে মিনিট এবং চতুর্থ স্থানে ঘণ্টা অথবা সংখ্যা এবং কয়েকটি অক্ষরের দ্বারা দেখানো হয় নির্দিষ্ট স্থান হইতে উহার পরিক্রমণ।

উক্ত সারণির তৃতীয় সারির প্রথম স্থানে সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত হয় প্রভাত তারা।

দ্বিতীয় স্থানে সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত হয় উহার ঘণ্টা, উহাদের মধ্যে কয়েকটির নীচে লিখিত থাকে "ড°" অক্ষর ঘণ্টার সহিত।

তৃতীয় স্থানে মিনিটে উহার উদয়ের সময়, চতুর্থ স্থানে দেওয়া হয় মাসিক দিনের সংখ্যা, যাহার দ্বারা উহাদিগের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয় প্রতিদিনে ওইগুলির পরিক্রমণের সময়।

১৭১৬ সালের ভারতীয় ক্যালেন্ডারের শুরুর মাস বৈশাখের প্রথম দিনের সারণি

ড°৬	১০	১০
১১	ড্ড°	ড্ড°
৪	২২	২৮
৪৩	০	১

উপরি দর্শিত সারণিটিতে বর্ণমালার অক্ষর এবং সংখ্যার দ্বারা তিনটি বিভাগে বিভক্ত ক্যালেন্ডারে রহিয়াছে একটি দিনের ব্যাখ্যা

ড° ৬–এই "ড" বর্ণমালার "দ" অক্ষর, যাহা লিখা থাকিলে দিন বুঝায়	১০-সংখ্যা ১০ চিহ্নিত করে সন্ধ্যাকালীন নক্ষত্র মঘা (নক্ষত্রের তালিকায় যেটি দশম)	১০-সংখ্যা ১০ চিহ্নটি বুঝায় প্রভাতের তারা কন্দের (গন্ধ) উদয় (চকা-র (যোগ) তালিকা দ্রষ্টব্য)
ড°-এটি ৬ নং সংখ্যা যেটির অর্থ শুক্রবার, ১৭১৬ সালের প্রথম দিন ১১ - এটি ১১ নং সংখ্যা যাহার দ্বারা দেখানো হইয়া থাকে চন্দ্রের একাদশতম দিন	ড°-৬ চিহ্নটি ৬ নং সংখ্যা, কিন্তু উহার নীচে লিখিত ড বুঝায় দণ্ড, অর্থাৎ নক্ষত্র উদয়ের সময়	ড°-৬, ছয় নং সংখ্যার চিহ্ন, এবং তাহার নীচে লিখিত ড অক্ষরের অর্থ দণ্ড অর্থাৎ নক্ষত্র উদয়ের ঘণ্টাটি
৪-চার নং সংখ্যা, যাহা বুঝায় চন্দ্রোদয়ের সময়	২২-দু'অঙ্কের এই সংখ্যাটি ২২ মিনিট	২৮-দু অঙ্কের এই সংখ্যাটি বুঝায় ২৮ মিনিট
৪৩-দু'অঙ্কের এই সংখ্যাটি বুঝায় ৪৩ মিনিট	০-এই চিহ্নটি দেখায় নক্ষত্রের গতিপথ অথবা অক্ষরেখা অতিক্রমণ করিয়া অন্তরিক্ষের জ্যোতিষ্কমন্ডলের অতিক্রমণ	১-এটি প্রথম সংখ্যার, যেটির দ্বারা বছরের চান্দ্র মাসগুলি ব্যতীত অসম সংখ্যক দিন লইয়া গঠিত মাসগুলির প্রথম তারিখ বুঝায়

এই পর্যায়ক্রমে ক্যালেন্ডারে বর্ণমালার অক্ষর এবং সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে বছরের প্রতিটি দিন এবং নক্ষত্রের গণনা।

বুঝিবার সুবিধার্থে নিম্নে মৎকৃত প্রস্তুত দশটি বিশেষ স্থানবিশিষ্ট, সারি দ্বারা বিভাজিত একই প্রকার সারণি অন্যভাবে প্রদত্ত হইল। তাহাদের মধ্যে—

সারণির প্রথম স্থানে সংখ্যার দ্বারা সপ্তাহের দিনগুলি চিহ্নিত হয়, যেইগুলির নাম সলতাগের দিন (সপ্তাহের দিন) বা সম্ভা মনা;

—দ্বিতীয় স্থানে চন্দ্রের দিন-তিথি, এবং তৃতীয় সারি বাদ দিয়া:

—চতুর্থ স্থানে চিহ্নিত হয় চন্দ্রোদয়ের ঘণ্টা, যাহার নাম দণ্ড বা পল;

—পঞ্চম সারিতে উহার মিনিট মুহূর্তিক ও সেকেন্ড নিমিক;

—ষষ্ঠ দুই সারিতে অন্যান্য সংখ্যা ও বর্ণমালার অক্ষর দ্বারা মেরুরেখা অতিক্রমণ, যাহা করণ নামে অভিহিত এবং সান্ধ্যকালীন এবং প্রভাতকালীন নক্ষত্রগুলির উদয় এবং অস্ত দর্শিত হয়;

—সপ্তম স্থানে প্রভাতকালীন নক্ষত্র একবচনে চক (যোগ) এবং বহুবচনে চকা (?) দর্শিত হয়;

—অষ্টম স্থানে উহাদের ঘণ্টা বা দণ্ড;

—নবম স্থানে উহাদের মিনিট মুহুর্তিক ও সেকেন্ড মিমিক;

—দশম স্থানে মাসের তারিখ।

এই সারণিটি বুঝিবার জন্য এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রহগুলির নামের পরিবর্তে উহাতে সংখ্যা বসানো হইয়াছে, যথা—ক্যালেন্ডারের সারণির বাম দিকে সাঙ্কেতিকভাবে সপ্তাহের দিনগুলির নাম যথা রবিবার

বা রবিদিন, রুশিতে ভসক্রেসেনিয়ে, সোমবার-রুশিতে পনিদেলনিক, মঙ্গলবার-রুশিতে ফ্তোরনিক, বুধরার-স্রেদা, বৃগস্পতিবার (বৃহস্পতি)-চেতভের্গ, শুক্রবার-পিয়াতনিৎসা, শনিবার-সুব্বাতা-র পরিবর্তে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়া থাকে।

সন্ধ্যাকালীন নক্ষত্র মঘা বা প্রভাতকালীন কন্ধা (গন্ধা) লিখিবার পরিবর্তে ১০ সংখ্যাটি লিখা হইয়া থাকে। এই সংখ্যাটির নিম্নে যেমন একটি, তেমনি অপরটিও জ্যোতির্বিদ্যার ক্রমানুযায়ী ২৭টি সন্ধ্যাকালীন নক্ষত্র নাচাত্রা তাবি বা নক্ষত্র ও চকা (যোগ) নামক ২৭টি প্রভাতকালীন নক্ষত্রের মধ্যবর্তী স্থানে রহিয়াছে।

এটির ন্যায়ই ক্যালেন্ডারের সারণির ডান দিকে দিবাকালীন গ্রহনক্ষত্রের নামের পরিবর্তে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বসানো হইয়া থাকে আদ্যাক্ষর, একটি অপরটির সহিত যুক্তাবস্থায় এবং কতিপয় বিযুক্তাবস্থায় অবস্থান করে, যাহা প্রায়শই দর্শিত হয় পঞ্জিকা অনুযায়ী উৎসবের দিন চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে।

কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়া আসিয়া ভারতীয় হিন্দু ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকার অনুরূপ মৎকৃত ক্যালেন্ডার প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাদিগের পঞ্জিকা অনুযায়ী ১৭১৬ সালের শুরুতে বৈশাখ নামক মাসের প্রথম দিন হইতে, যাহা তদানীন্তন নূতন গণনা অনুযায়ী ১৭৯৪ সালের ১১ এপ্রিল।

ইহাই দর্শাইতেছে যে, ১৭৯৪ সালের ৮ মাস এবং ১৭৯৫ সালের ৩ মাসের কিঞ্চিৎ অধিক সময় তৎকালীন ভারতীয় ১৭১৬ শকাব্দ এবং ১২০১ মহমেডান (হিজরি) ক্যালেন্ডারের সমান হইয়াছিল, যেথায় দেখা যাইতেছে ইংরেজি ক্যালেন্ডার ব্যতীত বর্তমানে দুই ধরনের ভারতীয় বর্ষগণনা প্রচলিত। একটির সূচনা হইয়াছিল দয়াপরায়ণ ও পরোপকারী সর্বশেষ সম্রাট শকাদিত্যের মৃত্যুর পর হইতে এবং অন্যটি মুসলমান বা মহমেডানদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের কিছু অংশে প্রাধান্য বিস্তারের পর।

আমাদিগকৃত মূল পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডারের অনুরূপ বলয় ও সারণি পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে এবং তৎসহ অনুরূপ একটি নকশাও প্রদত্ত হইল। (লেবেদেভের লেখা বইটিতে আছে কিন্তু সাধারণ পাঠকের আগ্রহের বিষয় নয় বিবেচনা করে বইটির ২য় সংস্করণে সেটি পরিশিষ্টে যোগ করা হয়নি)।

এই স্থানে সমাপ্ত হইতেছে পূর্ব ভারতের পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার, যাহা আমার উৎসুক দেশবাসীকে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে জানাইতে আমি আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু উহা শেষ করিবার পর আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছিল উপরোক্ত ক্যালেন্ডারের নকশার সূত্র ছাড়াও উহার কতিপয় টীকা, যাহা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করিয়া নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম, যথা—

প্রথম ভারতীয় মাস বৈশাখ, এপ্রিলের মাঝামাঝি হইতে মে মাসের মাঝামাঝি অবধি আরামদায়ক সময়, এবং এই সময় দক্ষিণ বায়ুর সহিত আগত বিভিন্ন ফুলের গন্ধ প্রীতিকর অনুভূতি সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় মাস চৈস্ত (জ্যৈষ্ঠ), মে মাসের মাঝামাঝি হইতে জুন মাসের মাঝামাঝি অবধি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফল আমড়া (?) বা আম ও অন্যান্য বহু ফল পক্বদশা প্রাপ্ত হয় এবং পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত হয়।

তৃতীয় মাস অষর্গ (আষাঢ়), জুন মাসের মাঝামাঝি হইতে জুলাই মাসের মাঝামাঝি অবধি, বর্ষার মেঘে আকাশ ছাইয়া যায় এবং প্রচণ্ড বজ্রপাত সহযোগে বৃষ্টির জলে নদী ভরিয়া যায়।

চতুর্থ মাস শ্রাবণ, জুলাই মাসের মাঝামাঝি হইতে অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি অবধি, এই সময় দিবারাত্র সমান, যখন রাত্রি, দিন হইতে আলাদা করিয়া বুঝা যায় রাত্রিকালীন নীল এবং সাদা আলোর দ্বারা যাহা রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ও দিনে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, দিন, রাত্রি হইতে আলাদা করা যায় দিনের আলোর দ্বারা—দিনের বেলা লাল এবং সাদা আলোর বৃদ্ধিতে ও রাত্রিকালীন হ্রাসপ্রাপ্তিতে। এই সময় নদী বর্ষার জলে এতই পরিপূর্ণ থাকে যে, স্থলপথে বহু স্থানে যাইবার উপায় থাকে না।

পঞ্চম মাস ভাদ্র, অগাষ্ট মাসের মাঝামাঝি হইতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি অবধি বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ নদীগুলি শান্ত থাকে এবং শুরু হয় আরামদায়ক সময়, যখন কয়েক মাসের জন্য ব্যবসা ও অন্যান্য কাজের জন্য সারা ভারতে যাতায়াতের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধাজনক হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ মাস আশ্বিন, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে অক্টোবরের মাঝামাঝি অবধি সময়ে উদ্‌যাপিত হয় দেবী দুর্গার উপাসনার্থে মহোৎসব।

সপ্তম মাস কার্তিক, অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে নভেম্বরের মাঝামাঝি অবধি সময়ে দেবী কালীর উপাসনার্থে মহোৎসব হয়। এই সময় হইতেই ধীরে ধীরে শীতল আরামদায়ক সময় শুরু হয়।

অক্রগায়ন বা অকগ্রন (অগ্রহায়ণ), অষ্টম মাসে, নভেম্বরের মাঝামাঝি হইতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে অনুভবযোগ্য ঠান্ডা পড়িতে শুরু করে, যেই সময়ে জমি হইতে ফসল তোলা হয় এবং খেতে শাকসবজির প্রাচুর্য থাকে।

নবম মাস পৌষ, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হইতে জানুয়ারির মাঝামাঝি অবধি, এই সময়ে দিন ছোট হইতে থাকে এবং রাত বড় হইতে থাকে।

দশম মাস মাঘ, জানুয়ারির মাঝামাঝি হইতে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি অবধি, পৃথিবীতে কুয়াশা এবং শিশিরযুক্ত অত্যন্ত ঠান্ডার সময়।

একাদশতম মাস **পালকর্ণ** বা **পালকন** (ফাল্গুন), ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি হইতে মার্চ মাসের মাঝামাঝি অবধি, যথেষ্ট গরম এবং অসহনীয় তপ্ত বায়ু যাহা সমস্ত জীবজন্তুদিগের রক্তে আগুন ধরাইয়া দেয়, বৃক্ষগুলির ফল উৎপাদনকারী রস এবং মনুষ্যদিগের চিন্তাভাবনা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ভারতীয় কোকিল এই সময় ডাকিতে থাকে, মৌমাছি ও পোকামাকড়ের গুঞ্জন এবং সমস্ত বৃক্ষ ফল ও পুষ্পে ভরিয়া উঠে।

দ্বাদশ মাস চৈত্র বা **চেইত্র**, মার্চের মাঝামাঝি হইতে এপ্রিলের মাঝামাঝি অবধি, এই সময় মধু ও অন্যান্য মিষ্টান্ন বিপুল পরিমাণে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গত, অসাধারণ এবং ভিনদেশি এই ক্যালেন্ডারের বর্ণনা করিতে গিয়া আমি বলিতে পারি না যে, ইহা সম্পূর্ণ নির্ভুল, কারণ আমি জ্যোতির্বিজ্ঞান শিখি নাই। তদুপরি ক্যালেন্ডার (পাঁজি) সংক্রান্ত সমস্ত মন্তব্য ভারতীয় হিন্দুগণ চিহ্নিত করেন শুধুমাত্র অক্ষর এবং সংক্ষিপ্ত শব্দের দ্বারা, যেইগুলিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—বিবিধ বস্তুর একই নাম অথবা একই বস্তুর বিভিন্ন নাম অনুযায়ী। সেইরকমই নাম বিভিন্ন গ্রহ এবং নক্ষত্রের, এমনকি ছয়টি ঋতুতে বার্ষিক পরিবর্তন, যাহা আলোচনার নিমিত্ত এই খণ্ডের শুরুতেই প্রদত্ত হইয়াছে সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার (পঞ্জিকা) সাধারণ টীকাসহ গ্রহনক্ষত্রের বিভিন্ন নাম কিন্তু ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা অনুবাদ করিতে গিয়া বহু ব্যাখ্যাহীন শব্দ আমার নজরে পড়িয়াছে। ইহা ব্যতীত, ভারতীয় লিপির চরিত্র, বহু ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তাকারে লিখিবার সময় বহু শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করিয়া থাকে। সর্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ এবং অনুবাদক যাঁহাদিগের দ্বারা অনুবাদের ব্যাপারে আমি পরিচালিত হইয়াছিলাম, তাঁহাদিগের মধ্যে মতের মিল না হইবার ফলে কলিকাতায় থাকাকালীন সময়ে আমি সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার (পঞ্জিকা) অনুবাদ করিয়া উঠিতে পারি নাই, স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া উহা সম্পূর্ণ করিয়াছি। অন্ততপক্ষে আমার আশা, যাহাদিগের ভাষাতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ রহিয়াছে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব, যেইহেতু সমস্ত ভারতীয় শব্দ মৎকৃত নির্ভুলভাবে উহাদের বানান এবং উচ্চারণ অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে, যাহার ভিত্তিতে আমার পরবর্তী প্রত্যেক ভ্রমণকারী অতি সহজেই দেশি জ্যোতিষী, ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন যেমন মূল শব্দগুলি তেমনি উহাদের অর্থসূচক চিহ্ন।

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র ব্রাহ্মণ্য রীতি বিষয়ক

পবিত্র ব্রাহ্মণ্য রীতি বা আচারগুলির মধ্যে ভারতীয় হিন্দুদিগের নিকট মুখ্য বলিয়া গণ্য হয় **উপাসনা** বা **উপদেশ গয় (?)** নামক পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গলেপন বিধি, চন্দ্র যুগের বৃহস্পতির প্রথম পরিক্রমণের কথা স্মরণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষীয় শিশুদিগের উপর যেই রীতিগুলি পালন করা হইত।

প্রথম অঙ্গলেপন বিধি দেবী দুর্গার নামে, যিনি যেইরূপ এই দেশে তদ্রূপ অন্যান্য কতিপয় স্থানেও, ত্রিদেবতা ভিন্ন অন্য কোনও বিশেষ দেবতা নহেন, বরং যেন তাঁহার কোনও অবতার অথবা ব্রহ্মা নামী স্বয়ং ভগবানকে সেইরূপেই বুঝায়, যেইরূপ খ্রিস্টানদিগের নিকট ভগবানের প্রতিটি রূপকেই স্বয়ং ভগবান বলিয়াই গণ্য করা হয়। যেই কারণে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই যে, এই প্রকার অঙ্গলেপনেই দুর্গাকে ত্রিদেবতার প্রথমজনের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়।

উক্ত রীতি/আচার উহাদিগের দেশে পালিত হয় নিম্নোক্তরূপে—ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পুরোহিত, প্রথমত পরীক্ষা করেন যাহার অঙ্গলেপন হইতেছে, সে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসনের ভিত্তি বুঝিতে পারে কি না ও যে বুঝিতে পারে, তাহার চুল ও কপাল লেপন করেন লাল রঙের সুগন্ধি লতাপাতা হইতে প্রস্তুত মিশ্রণ দ্বারা, ইহার পর তাঁহার গলায় সুতোয় বাঁধা বীজের মালা পরাইয়া দেন এবং সেই দিন হইতে কিশোরটি **"শক্ত"** এবং কিশোরীটি **"শক্তি"** অর্থাৎ ভগবৎজ্ঞানী বা পবিত্র নামে পরিচিত হয়, এই রীতি/আচারের মাধ্যমে নভোমণ্ডলে পরস্পর বিরোধী জ্যোতিষ্কগুলির বিক্ষোভের ফলে বিঘ্নিত সহমত ও ব্যবস্থাকে পুনঃস্থাপন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করিবার নিমিত্ত অন্তরিক্ষের সূর্যকে দৃঢ় রূপে উপস্থাপন করিবার ফলে দেবত্বজ্ঞানের প্রতি তাহাদিগের কৃতজ্ঞতার দায়দায়িত্ব নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয় অঙ্গলেপন বিধিটি কৃষ্ণের নামে, যিনি নামান্তরে **বিশতু** (বিষ্ণু), যাহার অর্থ দীক্ষিত ও দ্বিবজ, সেইটি পালিত হয় নিম্নোক্ত রূপে—ব্রাহ্মা, যিনি ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিয়মাচারের ভিত্তি সম্পর্কে শিষ্য-শিষ্যাগণকে বুঝাইয়া থাকেন, তিনি তাহাদিগের নাকের উপর হলুদ রঙের গন্ধযুক্ত মিশ্রণের প্রলেপ লাগাইয়া দেন এবং বালক বা বালিকাটির গলায় সুতায় গাঁথা তুলসীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণবিশিষ্ট কাষ্ঠ মাল্য বহু ক্ষেত্রে কার্নেলিয়ান পাথরের মালা পরাইয়া দেন, এবং তখন হইতে সে "কৃষ্ণভক্ত" এবং বালিকা হইলে "কৃষ্ণভক্তা", যাহার অর্থ খ্রিস্টান বা খ্রিস্টানি নামে পরিচিত হয়। সেই মহান মঙ্গলময় কর্ম, যাহা ঈশ্বরের পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়া তিনি মানবজাতিকে

পারমার্থিক জ্ঞান ও পবিত্র জীবনযাপনের পথ দেখাইয়া আলোকিত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতিতে, যাহা খ্রিস্টানদিগের নিকট **"সত্যসূর্য"** নামে অভিহিত।

তৃতীয় অঙ্গলেপন বিধিটি ত্রিদেবতার শিব অর্থাৎ যিনি নূতনের সূচনা করেন তাঁহার নামে এবং উহা চন্দ্রের নামে সম্পন্ন করা হইয়া থাকে নিম্নোক্তভাবে—ব্রাহ্মণ, ধর্ম ও নিয়মাচারের ব্যাপারে শিষ্যদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের সর্বাঙ্গ লেপন করেন একটি মিশ্রণ দ্বারা, যেটি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে সুগন্ধি লতাপাতা, ছাই, গোদুগ্ধ ও গোময় সহযোগে, তাহার পর কণ্ঠে পরাইয়া দেন সুতায় গাঁথা রুদ্র গাছের অমসৃণ বীজের মালা, রুদ্র —উহাদিগের উপলব্ধিতে প্রথম চন্দ্র যুগের বিরাজমান প্রাগৈতিহাসিক অপাপবিদ্ধ অবস্থা ভোগকারী লোহিতবর্ণের পাপস্খলিত পতিত কলঙ্কিত ব্যক্তি এবং প্রতি বৎসর একদিন সমস্ত গোষ্ঠীর মতাদর্শীরা এই অঙ্গলেপনের দ্বারা শুদ্ধ হইতেন।

চতুর্থ অঙ্গলেপন সূর্যের নামে, যাহা সম্পন্ন করা হয় নিম্নোক্ত উপায়েঃ ব্রাহ্মণ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিয়মাচার সম্পর্কে অবগত শিশুদিগের অঙ্গে শ্বেত বর্ণের ধূপ মিশ্রিত তৈল লেপন করেন, যাহা লেপনের ফলে তাহারা পবিত্র জীবনযাপনের ঈর্ষাজনক বিজয়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে এবং সারাজীবন হস্তে বহনের নিমিত্ত ভিক্ষুদিগের ন্যায় জপমালা প্রাপ্ত হয়, যাহা উহাদিগকে সৎকর্ম সাধনের শীর্ষে উঠিবার ধাপগুলি অতিক্রমণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পঞ্চম অঙ্গলেপনটি, জ্ঞানদা দুর্গার সন্তান গণেশ এবং **চৈশতন্য**-র (চৈতন্য) নামে অর্থাৎ জ্ঞানদাতা এবং আলোকদাতার নামে, উহা সম্পন্ন হয় নিম্নোক্ত উপায়েঃ ব্রাহ্মণ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুদিগের অঙ্গ উক্ত অঙ্গলেপনটির জন্য প্রস্তুত বিশেষ এক মিশ্রণ দ্বারা লেপন করেন, যাহা সম্পন্ন হইবার পর তাহারা **"ক্যেনপতি"** (জ্ঞানপতি) নামে অভিহিত হইয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞানদাতার সন্তানসন্ততি, যাহার দ্বারা মানসিক ও বৌদ্ধিক আলোকদাতার প্রতি তাহাদিগের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

উক্ত রীতি/আচারগুলির প্রতিটি উহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে আমাদিগের ***"ক্রিশেনিয়"*** বা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতকরণ পদ্ধতির পরিবর্তে।

পূর্ব ভারতের আরাধনাস্থল বা মন্দিরে পাঁচটি অঙ্গলেপন রীতির অনুরূপ একই পরমেশ্বরের আরাধনাকারী পাঁচটি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গোষ্ঠী রহিয়াছে, যাহাদিগের অঙ্গলেপন সম্পন্ন করিবার পদ্ধতি ভিন্ন।

উপরি উল্লিখিত ধর্মীয় অঙ্গলেপন ব্যতীত বহমান গঙ্গা নদীর জলে অবগাহনের মাধ্যমে শুদ্ধিকরণের বিধিও উহাদিগের রহিয়াছে। যাহাতে ত্রাণকর্তার কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হয়ঃ "যে দীক্ষিত নহে সে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

সাধারণভাবে খ্রিস্টানদিগের শুদ্ধিকরণে যেমন খ্রিস্টের দেহ ও রক্তের অনুকল্পে রুটি ও মদ্য দেওয়া হইয়া থাকে তেমনই হিন্দুদিগের উৎসর্গ করা শস্য, যাহা উহাদিগের ভাষায় চাউল, তাহা বিতরণ করা হয়।

খ্রিস্টধর্মে প্রচলিত পাপস্বীকার প্রথার অনুরূপ কিছু হিন্দুধর্মে আছে কি না তাহা লক্ষ করিবার সুযোগ আমি পাই নাই।

উহাদিগের পবিত্রতার সহিত সম্পর্কিত বিষয়গুলি অনেক বেশি কঠোর প্রমাণ ও পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত

বলা যাইতে পারে এবং তাহা সম্পন্নও হইয়া থাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে।

১২ বৎসরের পূর্বে উহাদের বিবাহ সম্পন্ন হয় না। ব্রাহ্মণগণ, বৈবাহিক বন্ধনে যাহারা আবদ্ধ হইবে, তাহাদিগকে উপদেশের মাধ্যমে পারস্পরিক দাম্পত্য দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝাইয়া থাকেন এবং মন্দিরের নিয়মানুযায়ী দেবতার নিকট আর্শীর্বাদ প্রার্থনা করেন সন্তানসন্ততির সহমত ও সত্ত্বর সর্বপ্রকার মঙ্গলকামনায়, তবে কে কাহার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবে, তাহা পিতামাতা সন্তানের ছয় বৎসর বয়স হইতেই স্থির করিয়া রাখিতেন এবং ইহার পরিবর্তন কখনও হইত না যদি না কোনও অদৃষ্টপূর্ব পরিস্থিতি অথবা আইনগত বাধা দেখা দিত।

দাম্পত্য কর্তব্য পালনের রীতি এতই কঠোরতার সহিত পরিলক্ষিত হইয়া থাকিত শুভানুধ্যায়ীদিগের দ্বারা যে, কোনও পুরুষেরই অধিকার ছিল না অন্য কোনও পুরুষের স্ত্রীকে দেখিবার, উহাদিগের পিতামাতা ব্যতীত, ভ্রাতাদিগেরও এমনকি প্রত্যেক ভগিনার নিকট উহাদিগের পিতামাতার উপস্থিতি ভিন্ন যাইবার পথ ছিল না।

কিন্তু এইগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইত বর্ণবিভাগ অনুযায়ী প্রথম বিশেষ শ্রেণিভুক্তদিগের মধ্যে, অন্যান্যদিগের মধ্যে সর্বদা উহা পালিত হইত না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মন্দির, গহনা ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি বিষয়ক

ভারতীয় হিন্দুদিগের আরাধনাস্থান মন্দির, ইউরোপীয়গণ যাহাকে "প্যাগোডা" বলিয়া থাকে, উহার ভিতর ও বাহির কিয়দংশে র্তি পূজারী ও খ্রিস্টানদিগের আরাধনাস্থানসদৃশ।

আরাধনাস্থানগুলি দুই ভাগে বিভক্ত—সর্বজনীন, যেই স্থানে দেবতার পূজায় ইচ্ছুক সকলে একত্রে সমবেত হয় ও প্রতাপশালী ব্যক্তি বা ধনীর গৃহে নির্মিত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মন্দির, যাহার দ্বার মহোৎসবের দিনগুলিতে কেবলমাত্র স্বধর্মীই নহে এমনকি বিধর্মীদিগের জন্যও অবারিত থাকে।

ভারতীয় হিন্দুগণ সর্বজনীন মন্দিরকে **এক তোড়া** বা এক চূড়া, **দুই তোড়া** বা দুই চূড়া, **তিন তোড়া** বা তিন চূড়া, **পাঁচ** তোড়া বা পাঁচ চূড়া, নয় চূড়া বা নবর অর্তন (নব রত্ন)-এ বিভক্ত করিয়া থাকে।

খ্রিস্টানদিগের ক্রুশের পরিবর্তে মন্দিরের চূড়ায় বসানো থাকে কাষ্ঠ বা ধাতু নির্মিত শ্বেত বর্ণের পবিত্র পক্ষীদিগের মধ্যে একটি, এবং কদাচিত চূড়া ও পক্ষীর পরিবর্তে মন্দিরের উপরিভাগে অবস্থিত থাকে একটি গোলাকৃতি মুণ্ডবিশিষ্ট বা মুণ্ডবিহীন শলাকা।

উহাদিগের মন্দিরের ভিতর বিশেষরূপে সজ্জিত করা হইয়া থাকে বিভিন্ন দেবদেবীর লীলা বর্ণনাকারী চিত্র দ্বারা, যেগুলির উল্লেখ এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে রহিয়াছে।

প্রতিটি মন্দিরে বিস্তৃতভাবে চিত্রিত থাকে উহাদিগের বিভিন্ন কল্পকথায় বর্ণিতা সর্বলীলাময়ী দেবী দুর্গা, যিনি উহাদিগের রীতি অনুযায়ী অলঙ্কার বা বিবিধ গহনায় সজ্জিতা, যথা:

প্রতিটি মন্দিরে বিস্তৃতভাবে চিত্রিত থাকে উহাদিগের বিভিন্ন কল্পকথায় বর্ণিতা সর্বলীলাময়ী দেবী দুর্গা, যিনি উহাদিগের রীতি অনুযায়ী অলঙ্কার বা বিবিধ গহনায় সজ্জিতা, যথা:

পৈচি পৈচি, মণিবন্ধ, কঙ্কণ;

বাচু বন্ধ (বাজুবন্ধ), কনুই বা হাতের উপরের দিকে যে গহনা পরা হইয়া থাকে;

কর্ণ পুল, কথ্য ভাষায় ফুল, কানের দুল;

নকের নত (নাকের নথ) বা **নরলোক** (নোলক), নাকের তরুণাস্থি বা পাটায় ছিদ্র করিয়া পরিতে হয়;

শিতের টিকি (সিঁথির টিকলি), বিভিন্ন দামি পাথর হইতে ঝুলন্ত গহনা;

নেপ্রিল পাতা (?), কানের উপর দিকের তরুণাস্থিতে পরিবার দুল;

পাঁচ নড়ি, পাঁচ সুতা/নড়ির কণ্ঠহার;

কোল মালা (কড়ি মালাই), কণ্ঠহার;

দানা, স্বর্ণচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত ছিলে কাটা কণ্ঠহার;

চাল কলি, গোলাকৃতি স্বর্ণচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত কণ্ঠহার;

রাম নমি, দেবতার নাম লিখিত চতুষ্কোণবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ফলক, ক্রুশের পরিবর্তে পরা হইয়া থাকে;

মন অথবা **মান দোলি** (মাদুলি), হাতের দুইটি কঙ্কণের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র গহনা;

অড়নী অথবা **উড়নী**, বক্ষের বস্ত্র;

পানশুয়াস, পেটিকোট;

পাচামা (পাজামা) বা **পেশুয়াচ**, পুরুষ বা স্ত্রীদিগের লম্বা বসন;

শাড়ী, অঙ্গবেষ্টনী।

উহাদিগের প্রতিটি সর্বজনীন মন্দিরে দেবতার সম্মুখের আকারে বেদিসদৃশ বিশেষ একটি প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে, যেটির দরজার সম্মুখে কোনও কোনও মন্দিরের মধ্যস্থলে রহিয়াছে যূপকাষ্ঠ নতুবা সিংহাসন, যেইটি বিভিন্ন প্রকার কঠিন হইয়া যাওয়া মিশ্রণে তৈয়ারি, মসৃণতায় ও চাকচিক্যে মার্বেল পাথর সদৃশ হইলেও সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণের, যেইটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থা, যাহার ভারতীয় নাম কল্প, তাহার প্রতীক।

আরাধনার সময় উহার উপর রাখা বিভিন্ন প্রকার ধূপকাঠি হইতে ধূম্র নির্গত হয় এবং বহুবিধ গুপ্ত আচার সম্পন্ন হয় কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা, যাহাদিগ বিনা অন্য কাহারও উহা স্পর্শের অধিকার নাই।

মন্দিরে উহাদিগের আরাধনা বহুলাংশেই প্রার্থনাপাঠের পরিবর্তে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসনের ব্যাখ্যা সহযোগে সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

পররবি বা পুরবী (পরব্) নামক ভারতীয়দিগের মুখ্য উৎসগুলি এবং ওইগুলি উদ্‌যাপনের চমৎকারিত্ব বিষয়ক

প্রথম মাস বৈশাখের উৎসবগুলি

ভারতীয় হিন্দু ক্যালেন্ডারে বা পঞ্জিকায় প্রথম উৎসব হিসাবে গণ্য হয় নববর্ষ, যাহার নাম চড়ক, যাহা উহাদিগের দ্বারা পালিত হয় চৈত্র মাসের ৩১ তারিখে, ইউরোপীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১০ এপ্রিল, যখন পুরাতন বৎসর শেষ হইয়া নুতন বৎসরের সূচনা হয়। বৈশাখ মাসের পয়লা তারিখ, ১১ এপ্রিল উহাদিগের নূতন বৎসর শুরু হয়।

নূতন বৎসর শুরু হইবার দুই সপ্তাহ পূর্বে ব্রাহ্মণগণ স্বেচ্ছাযন্ত্রণাভোগের পূর্বপ্রস্তুতিপ্রাপ্ত ধর্মানুচারে আগ্রহী সন্ন্যাসীদিগকে জনতার সম্মুখে বাহির করেন বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থায়, যথা—কয়েকজনের উভয় স্কন্ধের মাঝামাঝি এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র করিয়া চর্ম ভেদ করিয়া প্রথমে সরু দড়ি ঢুকাইয়া জনতা তাহাদিগকে ওই দড়ি ধরিয়া গ্রাম ও শহরের পথে-ঘাটে ঘুরাইয়া থাকে, অন্যদিগের জিহ্বায় ছিদ্র করিয়া দৈর্ঘ্যে দেড়-দুই হাত লৌহ নির্মিত শলাকা ঢুকাইয়া দেয়, যেটি যন্ত্রণাভোগীগণ সুবিধা অনুযায়ী নিজ ইচ্ছায় ছিদ্রটির মধ্যে ঢুকাইতে বা বাহির করিতে পারে।

এইরূপ অবস্থায় ঘুরাইবার সময় তাহাদিগের অগ্রে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান গাহিতে গাহিতে, ধূপ-ধুনা দিয়া ঘিরিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিপুল জনতা দলবদ্ধভাবে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া থাকে এবং যন্ত্রণাভোগীগণ আনন্দে মত্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে লম্ফঝম্পে ও নৃত্যে রত হয়।

নূতন বৎসরের এই শুরুর দিনেই উহাদিগকে লইয়া আসা হয় নির্দিষ্ট প্রশস্ত স্থানে, যেই স্থানে আমাদিগের কূপ হইতে জল উত্তোলনের স্তম্ভের ন্যায় ছয় হইতে আট ফ্যাদম* উচ্চতাবিশিষ্ট উহাদিগের জন্য তৈয়ারি কাঠামোর চতুর্দিকে উহারা ঘুরিতে থাকে।

ইহার পর উপরোক্ত দড়ির পরিবর্তে যন্ত্রণাভোগীদিগের স্কন্ধের সেই ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া লৌহ নির্মিত আংটি সমেত আংটা পরানো হইয়া থাকে, যেটির সহিত কাঠামোটির এক পার্শ্বে তাহাদিগকে বাঁধা হইয়া থাকে এবং অপর পার্শ্বে লাগানো দড়ি ধরিয়া কিছু জনতা যন্ত্রণাভোগীদের চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে এবং ইত্যবসরে, তাহাদিগের জোব্বায় রাখা সেই স্থানের বৃক্ষের ফল ও পুষ্প বিপুল পরিমাণে বাকি জনতার উপর বর্ষণ করিতে থাকে, লোলুপ জনতা তীব্র গতিতে উহা কুড়াইয়া লয়, যেইহেতু ওইগুলি কাল্পনিক সন্তদিগের এক বিশেষ

ধরনের আশীর্বাদের চিহ্ন বলিয়া তাহারা গণ্য করে এবং অসীম শ্রদ্ধার সহিত উহা ভক্ষণ করিয়া থাকে।

এই রীতির মাধ্যমে তাহারা সম্ভবত বর্ণনা করিয়া থাকেন, দুর্গার স্বপক্ষীয়, যাহাদিগের সহিত কোনও এক সময়ে তিনি অসুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের অনুকরণকারী অমর যশপ্রাপ্তিতে আগ্রহীগণের জীবনে প্রলোভন ও হানিকর বিষয়ের উপস্থিতির অবশ্যম্ভাবিতা।

দ্বিতীয় (**পুরবী**) উৎসব শুরু হয় বৈশাখ মাসের ১১ তারিখ, যাহা ইউরোপীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২১ এপ্রিল। **স্কন্ড** (ষষ্ঠী?) নামক এই উৎসব সন্তানসন্ততিদিগের ভরণপোষণ ও সান্ত্বনাদানের উৎসব হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে।

তৃতীয় উৎসব **কশ গো শ্রী** (?) ওই বৈশাখ মাসেরই ১৯ তারিখ অথবা ২৫ এপ্রিল পালিত হয় গবাদি পশুর পৃষ্ঠপোষক দেবীর স্মরণে।

চতুর্থ উৎসব ওই মাসেরই ২৬ তারিখ, যাহা ইউরোপীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৬ মে, উহাদিগের এক সজ্জন ও অলৌকিক ক্ষমতাধিকারী শ্রদ্ধেয় রাজা ভগীরথের স্মরণে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

পঞ্চম উৎসব **পিপীতকি** (পিপীতকি দ্বাদশী), ওই বৈশাখ মাসেরই ৩১ তারিখ অথবা ১১ মে, যেই দিনটি মৃত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশ্যে তর্পণের নিমিত্ত নির্ধারিত।

ওই দিন ভারতীয় হিন্দুগণ গৃহে গমজাতীয় শস্য, বিভিন্ন ফল ও পুষ্প এবং পান করিবার জন্য বৃক্ষ হইতে আহৃত রস হইতে তাড়ি প্রস্তুত করিয়া মৃত ব্যক্তিদিগকে নিবেদনের জন্য লইয়া আসে সেই স্থানে, যেই স্থানে ব্যক্তিটির সৎকার হইয়াছিল, মৃতদিগকে কবর দিবার রীতি তাহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না, বঙ্গদেশে মৃতদেহ নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়, পক্ষ ও মৎস্য উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করে, কিন্তু মালাবার উপকূলে মৃতদেহ দাহ করিবার রীতি রহিয়াছে।

উপরে যে তাড়ির কথা বলা হইয়াছে, ইউরোপীয়দিগ যাহার নাম দিয়াছে কোনোনাট, উহা আমাদিগের বার্চ বৃক্ষের রসের ন্যায়, উহার রস পাত্রে সংগ্রহ করা হয়, যখন সেইটি মদ্য হইয়া যায় তখন উহা গম হইতে প্রস্তুত মদের ন্যায় কড়া কিন্তু তুলনামূলকভাবে স্বাদু হইয়া থাকে। দিনে দুই পাত্র করিয়া ওই মদ্য ইউরোপীয় জাহাজের নাবিকদিগকে দেওয়া হইত, চুলকানি যাহা সমুদ্রপথে যাত্রাকালীন লবণাক্ত খাদ্যগ্রহণের ফলে হইত তাহা নিরাময়ের জন্য, সাধারণত ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যাহারা চাহিত, তাহারা প্রতিদিন উহার রস বানাইত, উহার সহিত বিয়ার মিশ্রিত করিয়া, ইংরেজদিগের ভাষায় নামিদামি পানীয় "কান্ট্রি বিয়ার" তৈয়ারি করিত, কিন্তু যখন সেই রস মিশাইত সাদা আঙুরের মদ্যের সহিত তখন রোগ উপশমকারী সেই মিশ্রণ শ্যাম্পেন হইতেও অধিক পছন্দসই হইত, অসুবিধা হইত তাহাদিগের, যাহারা মাত্রাধিক সেবন করিবার ফলে উদরে বায়ুর চাপ অনুভব করিত।

দ্বিতীয় মাস চৈশতর (জ্যৈষ্ঠ) উৎসবগুলি পালিত হইত আলোকিত,
উষ্ণ ও বৃক্ষলতা দ্বারা সজ্জিত ইউরোপীয় মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে জুন-এর প্রথমার্ধে

ভারতীয় মাস **চৈশত** (জ্যৈষ্ঠ) ২ তারিখ অথবা ইউরোপীয় ১৩ মে উহারা **নর-সিংহ**, ভারতীয় নাম **নির সিংহ** (নৃসিংহ)-র স্মরণে উৎসব পালন করিয়া থাকে।

সিংহ হিয়েরোগ্লিফিক ও প্রতীকবাদী সকলের নিকটই সাধারণভাবে রাজকীয় মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে, যাহার ফলে বর্তমানে বহু রাষ্ট্রই উহাকে নিজদিগের জাতীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতীয় হিন্দুগণের ধারণায় এই সিংহ ভগবান কৃষ্ণর পুত্র। উহাদিগের মতে, একদা নৃসিংহ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা হিরণ্য কশেশালের (হিরণ্যকশিপু) সহিত লড়াই করেন, যাহার নামের অর্থ ''অতিশয় গর্বিত'', যিনি কৃষ্ণর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজ পুত্র প্রলগাত বা পেরল্লাতকে (প্রহ্লাদ) হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ওই সিংহমানব পুত্রকে রক্ষা করেন এবং পিতাকে নিধন করেন।

এই কল্পরূপের সহিত বহুলাংশে সেই সিংহটির চরিত্রের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, যাহার উল্লেখ ও প্রমাণ পাওয়া যায় পুণ্য ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞের বাণী হইতে—''জুডাসের (Judah, lion of Judah) হাঁটু হইতে উদ্ভূত সিংহের জয় হইল—'' (অ্যাপোকালিপস্, ৫ম পর্ব)** এবং যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে যে, সে শয়তানের রাজত্ব ধ্বংসকারী ও মানবজাতির রক্ষাকর্তা।

চৈশত (জ্যৈষ্ঠ) মাসের ১১ তারিখ অথবা ২১শে মে, ভারতীয় হিন্দুগণ ত্রিত্বের একরূপ শিবের স্মরণে তাঁহার পূজা উপলক্ষ্যে উৎসব করিয়া থাকেন। ভারতীয়রা বলিয়া থাকেন যে, যখন শিব পদাধিকার অনুযায়ী তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন তখন দেবী দুর্গা প্রেমের দেবতা রত ***-কে শিবকে কর্তব্য হইতে বিরত করিয়া কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশলাভের অছিলায় নিজের নিকট ডাকিয়া আনিবার জন্য শিবের নিকট প্রেরণ করেন।

প্রেমের দেবতার প্রস্তাবে শিব এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে ক্রোধে তাঁহার চক্ষু হইতে নির্গত অগ্নিশিখায় প্রেমের দেবতা ভস্মীভূত হন।

রতিপতি (রতি), প্রেমের দেবতার স্ত্রী, দেবী দুর্গার নিকট মিনতি জানান তিনি যেন তাঁহার স্বামীর জীবন ফিরাইয়া দেন, দুর্গা তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিলেও তিনি কায়াহীন হন, যাহার ফলে যেই সময় হইতে ভারতীয়গণ প্রেমের দেবতার নামকরণ করেন অনঙ্ক (অনঙ্গ) অর্থাৎ রক্ত-মাংসের শরীরবিহীন।

কল্প এই রূপগুলির অর্থ অন্য কিছুই ইহা ব্যতিরেকে নহে যে, প্রকৃত সর্বেশ্বরকে কোনও প্রকার মনুষ্যোচিত আবেগ সাজে না, মানব জাতির পরিত্রাণ সম্পর্কে ঈশ্বরের বাণী অনড়, পবিত্র আত্মার মঙ্গল কর্মের দ্বারা সকল প্রকার শারীরিক অপবিত্রতা পুড়িয়া যায় ও পুনর্জীবনপ্রাপ্ত মানুষগণ ধার্মিক হইয়া থাকেন।

উক্ত মাসের ১৬ তারিখ বা ২৬ মে উহাদিগের মহিলাকুলের সাবিত্রী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, যেই উৎসবে এয়োস্ত্রীগণ উহাদিগের নিয়ম অনুযায়ী আকুল প্রার্থনা জানাইলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহারা স্বামীকে হারাইয়া ফেলেন না এবং ভবিষ্যতেও স্বামীর সহিত তাঁহাদিগের বিচ্ছেদ ঘটে না।

চৈশত (জ্যৈষ্ঠ) মাসের ১৮ তারিখ বা ২৮ মে, উহাদের **কচ**, গাতি (হাতি) বা বারণ নামক উৎসব পালিত হইয়া থাকে যেই দিন উহারা দাতব্য করিয়া থাকে এবং চায়ের পাতার মতো অতি ক্ষুদ্র দানও হস্তীর উচ্চতার তুল্য গণ্য হইয়া থাকে।

চৈশত (জ্যৈষ্ঠ) মাসের ২৩ তারিখ বা ৭ জুন, রাজা ভগীরথের দ্বারা আনীত গঙ্গা নদীর জলের বৃদ্ধি ও হ্রাসপ্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়া দশ গড়া (দশ ঘড়া) নামক উৎসবে ভারতীয়গণ গঙ্গা নদীতে দশবার ডুব দিয়া থাকেন।

ওই **চৈশত** (জ্যৈষ্ঠ) মাসেরহ ৩০ তারিখ বা ৯ জুন প্রথম সৃষ্ট মানুষের স্ত্রী বিশকা-র (বিশাখা) স্মরণে উৎসব পালনের নিমিত্ত নির্ধারিত।

চৈস্ত (জ্যৈষ্ঠ) মাসের ৩১ তারিখে কোনও উৎসব থাকে না।

তৃতীয় মাস অসর্গ-ব (আষাঢ়) উৎসব, ১ আষাঢ় নূতন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১১ জুন

এই মাসের ১৮ তারিখ ভারতীয় হিন্দুগণ সারা শহর জুড়িয়া জাঁকজমকপূর্ণ পদযাত্রার আয়োজন করে রত—এর স্মরণে, খোদাই করা মূর্তিটিকে প্রথমে মন্দির হইতে বাহিরে ওই রাখিবার উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত বাক্স, কদাচিৎ উহা ব্যতীত, মন্দিরের আদলে নির্মিত রথে আনিয়া রাখে, যেটি দড়ির সাহায্যে বিপুল জনতার দ্বারা টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় ও গীতবাদ্য সহযোগে রথের সম্মুখে বালিকার দল নাচিতে থাকে এবং ওইরূপ অবস্থায় রথটিকে গন্তব্যস্থল অবধি লইয়া যাইবার পর ৮ দিন ওইস্থানেই রাখিয়া দেওয়া হয়, ওই মন্দিরটিতেই, যেই মন্দিরে উক্ত কয়েকটি দিন ব্যতীত মূর্তিটির সর্বক্ষণের অবস্থান এবং ওই সময় হইতেই উহাদের জমি অকর্ষিত শান্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে যেহেতু ওই সময় হইতেই প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হইয়া যায় যাহা আশ্বিন মাস বা ১ অক্টোবর অবধি চলিতে থাকে।

ষষ্ঠ মাস, সংস্কৃতে আশ্বিনঃ, বাংলায় আশ্বিনের উৎসব, ১ আশ্বিন ইংরেজী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৪ই সেপ্টেম্বর

আশ্বিন মাসের ১৮ তারিখ বা ১ অক্টোবর ভারতীয় হিন্দুগণ দেবী দুর্গার মহিমা স্মরণে উৎসব বা পূজা করেন, যিনি নামান্তরে কালী, উমা, শক্তি, সোমা প্রমুখ।

দুর্গার নামে প্রথম অঙ্গলেপন করিবার রীতির কথা প্রসঙ্গে পূর্বে যে কথাটি উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দেবমহিমা বলিতে তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন মুখ্যত সর্বজ্ঞানী ও সর্ব ক্রিয়াশীল সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্ব পরিচালককে, এবং কদাচিৎ কৃষ্ণের মাতা **চশো**-কে (যশোদা), যাহার নামের অর্থ আলোকদায়ী, গ্রিক-রুশ চার্চও ঠিক ওই দিনই আলোকদায়ীর স্মরণে উৎসব করিয়া থাকে।

বাস্তবিকই ভারতীয় হিন্দুদিগের দুর্গা এবং খ্রিস্টানদিগের মা মেরির প্রতিকৃতির মধ্যে প্রায় কোনও পার্থক্যই লক্ষিত হয় না, এমনকি মাথার মুকুট, হস্তবন্ধনী, গলার গহনাতেও মিল রহিয়াছে, তফাত কেবলমাত্র মুখের কৃষ্ণবর্ণে।

উৎসবটি উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে নিম্নলিখিত আচার পালনের মাধ্যমে। উক্ত দিবসে পূজার মন্দির ও গৃহস্থ বাড়ি হইতে বাদ্যগীত সহযোগে সুসজ্জিত যানে করিয়া উত্তমরূপে সজ্জিতা দুর্গার মূর্তি বাহিরে আনিয়া গ্রামের মধ্যে গঙ্গাতীরবর্তী নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানো হয়, যেই স্থানে পূজা ও সঙ্গীত সমাপ্তির পর, উৎসবের নিয়মানুযায়ী কৃষ্ণবর্ণের বর্ষার মেঘ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া ঋণশোধের নিমিত্ত দেবী দুর্গার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক ওই নদীর জলে মূর্তিটিকে নিমজ্জিত করা হয়। ওই দিন হইতে উহাদের আরামদায়ক শীতল আবহাওয়া শুরু হইয়া অক্ষুণ্ণ থাকে মাঘ মাস অবধি, যাহা জানুয়ারির একাংশ জুড়িয়া এবং ওই মাসেই বৃক্ষরাজি পল্লবিত হইয়া থাকে।

এই সময় সরলহৃদয় হিন্দুদিগের মূর্তি বিসর্জন দিবার প্রথা নিন্দা করিয়া স্থানীয় ভারতীয় মুসলমানগণ সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে দুরভিসন্ধি লইয়া জলে বিসর্জিত দুর্গার মূর্তিটিকে আত্মসাৎ করিবার, যাহার ফলে প্রায়শই তাহাদিগের ও হিন্দুদিগের মধ্যে দাঙ্গা ও কদাচিৎ রক্তপাত হইয়া থাকে।

সপ্তম মাস কার্তিকের উৎসব, ১ কার্তিক ১৪ অক্টোবর

কার্তিক মাসের ১০ তারিখ বা ২৪ অক্টোবর ভারতীয় হিন্দুগণ দেবী কালী, যিনি নামান্তরে সোমা, তাঁহার আরাধনা করেন পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক অবস্থার স্মরণে, যে অবস্থায় আমাদের পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের বলয়গুলি আলোকিত হইত চন্দ্রের দ্বারা, জ্যোতির্বিদগণ যাহাকে সাধারণভাবে **কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ** (চাঁদের কলঙ্ক) বলিয়া গণ্য করেন, যদিও ভারতীয়গণের কল্পিত গল্পে চন্দ্র, সূর্যের পরিক্রমণ সম্পূর্ণ হইবার মুহূর্তে উপরোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরের সহিত রণে রত দেবী দুর্গার নেত্র হইতে অনুপ্রবিষ্ট।

ওই দিন উহাদের সমস্ত মন্দিরে রাত্রিব্যাপী দেবীপুজার মাধ্যমে উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং উষাকালে কলিকাতা হইতে তিন মাইল দূরে, তাঁহাদের কথায় যেই স্থানে পুরাকালে প্রথম দেবীর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, অদ্যাবধি যেই স্থানটি দেবীর নামে "কালীঘাট" নামে পরিচিত, যাহার অর্থ দেবীর দেউড়ি। তদুপরি অধুনা উন্নতিশীল শহর কলিকাতার নামকরণও এই নাম হইতেই হইয়াছে।

যদিও ব্রাহ্মণগণ এই জায়গায় কোনও এক পাথরের কথা বলিয়া থাকেন, যাহার তল হইতে নাকি গঙ্গা নদীর উৎসরণ ঘটিয়াছিল।

দ্বাদশতম মাস চৈত্রর উৎসব, ১ চৈত্র ১১ মার্চ

চৈত্র মাসের ৫ তারিখ বা ১৫ মার্চ উহাদের সামাজিক উৎসব **দোলচোত্রা** (দোলযাত্রা) উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

ওই দিন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রক্তিম বর্ণে কেবলমাত্র নিজদিগের মুখ, কেশ, হস্ত-পদ-নখই নয় এমনকি পরিধেয় বস্ত্রও রঞ্জিত করিয়া থাকে কোনও এক বৃক্ষছাল বা রজন (গাছের আঠালো রসবিশেষ) হইতে প্রাপ্ত আলতা নামক পদার্থ দ্বারা এবং ওইরূপ বেশে নিজদিগের বাগানে অথবা অঙ্গনে রজ্জু দ্বারা স্তম্ভের সহিত বাঁধা আমাদিগের দোলনার ন্যায় ঝুলায় দোল খাইতে থাকে।

উৎসব সম্পর্কিত উপসংহার

উপরোক্ত ধর্মীয় উৎসব ব্যতিরেকে ভারতীয় হিন্দুদিগের আরও কয়েকটি উৎসব রহিয়াছে, যেইগুলি নিজের শুভকর্ম ও সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত রাজা এবং বীরদিগের সম্মানে পালিত হইয়া থাকে কিন্তু অবস্থার কারণে যেইগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা আমার পক্ষে করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই।

---

* **ফ্যাদম**- ৪২-৫৬ ফুট।

** অ্যাপোকালিপস্- বিশেষত জগতের ভবিষ্যৎ পরিণতি বিষয়ে ঈশ্বরলব্ধ জ্ঞানের প্রকাশ, বাইবেলের শেষ অধ্যায়, এই অধ্যায়ে রোজ-কেয়ামত বিষয়ে সেন্ট জনের ঈশ্বরলব্ধ দিব্যজ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে।

*** রত- রতির স্বামী কন্দর্প।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় জনগণের পদের ও উপাধির ভিন্নতা বিষয়ক

ভারতীয় হিন্দুগণ প্রধানত চারিটি শ্রেণিতে উঁহাদিগের পদ ও উপাধি বিভক্ত করিয়াছেন, যাহার নাম চার জাত।

প্রথম শ্রেণিতে উঁহাদের অতি শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণদিগের স্থান, যাঁহারা পদমর্যাদার ভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপাধিধারী।

প্রথম সারির আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণ অধ্যক্ষ বা আচার্য নামে অভিহিত, যাঁহাদের নামের পূর্বে লিখা হইয়া থাকে **"শ্রীশ্রীবিদ্যে শর মন দক্ষ্য"** (শ্রীশ্রীবিদ্যে শর্মণ অধ্যক্ষ), যাহার অর্থ সজ্জনতম অধ্যক্ষ বা আচার্য মহাশয়।

দ্বিতীয় সারির ব্রাহ্মণগণ পদমর্যাদায় আমাদিগের আর্চ বিশপদিগের সমতুল্য, উঁহারা **"বিদে সাকর"** (বিদ্যা সাগর) নামে পরিচিত, যাহার অর্থ জ্ঞানের সাগর এবং তাঁহাদিগের নামের নিম্নে লিখা হইয়া থাকে **"শ্রীশ্রীবিদে সাকর"** অর্থাৎ দীক্ষিতশ্রেষ্ঠ মহাশয় অথবা তাত বা পিতা।

তৃতীয় সারির ব্রাহ্মণগণ পদমর্যাদায় আমাদিগের বিশপদিগের সমতুল্য, উঁহারা **"বিদে নিধি"** (বিদ্যানিধি) নামে পরিচিত, যাহার অর্থ তলহীন বা অতল জ্ঞান, যেই কারণে উঁহাদিগের নামের নিম্নে লিখিত উপাধির অর্থ মহান জ্ঞানী মহাশয় অথবা তাত **বিদে নিধি**।

চতুর্থ সারির ব্রাহ্মণগণ পদমর্যাদায় আমাদিগের আর্চম্যানড্রিটদিগের সমতুল্য, উঁহারা **"বিদে রত্ন"** (বিদ্যারত্ন) নামে পরিচিত, যাহার অর্থ জ্ঞানের ছটা বা বিচ্ছুরণ, তাঁহাদিগের নামের নিম্নে লিখা হইয়া থাকে পণ্ডিতপ্রবর বা তাত **বিদে রত্ন**।

পঞ্চম সারির ব্রাহ্মণগণ পদমর্যাদায় আমাদিগের প্রধান যাজকের সমতুল্য, **"বিদে লঙ্কার"** (বিদ্যালঙ্কার) নামে পরিচিত, যাহার অর্থ জ্ঞানের প্রাচুর্য এবং ইহা লিখার অর্থ—বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতম মহাশয় বা তাত, যাহা বিদ্যালঙ্কার উপাধির মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ সারির ব্রাহ্মণগণ পদমর্যাদায় আমাদিগের ক্লারজিম্যানদিগের সমতুল্য এবং পুরোহিত নামে পরিচিত, নামান্তরে ভট্টাচার্য অর্থাৎ মন্দিরের পূজারি, যাহাদিগের নামের নিম্নে লিখা থাকে পূজনীয় পুরোহিত মহাশয়।

সামগ্রিকরূপে ঈশ্বরসেবকগণ **চেস্তু** (?) নামে পরিচিত, যাহার অর্থ মরমিয়া, ইহা জাতি বুঝায় না, যেরূপ অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন।

অধিকন্তু প্রতি পত্রের শুরুতে বিষয়বস্তু লিখিবার পূর্বে হিন্দুগণ নিজ নিজ আরাধ্য দেব-দেবী দুর্গা, ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, শিব অথবা গণেশের নাম লিখিয়া থাকেন।

তদুপরি রাজা হইবার গুণাবলি বা অধিকারও ব্রাহ্মণ বর্ণের ছিল, যেই কারণে পুরাকালে সাধারণত উঁহাদিগের রাজাগণও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইতেন, সেই হেতু রাজা বা সম্রাটকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু লিখিতে হইলে রাজা বা সম্রাটের উপাধি এবং বিষয়বস্তু লিখিবার পূর্বে উঁহাদিগের আরাধ্য দেবতার নাম লিখা হইত নিম্নলিখিত রূপে—

শ্রীশ্রীহরি ৪ সহায়, অর্থাৎ চতুরানন ভগবান হরির (ব্রহ্মা) পবিত্র নাম সহায়, ইহার পর উপাধিঃ

মগা মগিম শ্রীচুত মগা রাচা (নাম) নব কৃশান বাগদুর মগক্র প্রতাপেষ (মহামহিম শ্রীযুক্ত মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর মহাপ্রতাপেষু)।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে উঁহাদিগের ধারণায় রহিয়াছে যোদ্ধা, সজ্জন ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অবস্থান ও পদ যাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত, যাঁহাদিগের মধ্যে—

১) **অদগিকার বাদশা** (অধিকার বাদশা) বা **অদগিকার অমলা** (অধিকার আমলা), একাধিপতি।

২) **বড় সাগেব** (বড় সাহেব) বা গাকিম (হাকিম), গভর্নর।

৩) **মির্চা** (**মির্জা**), উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা।

৪) **শ চাদা** (শাহজাদা), মনোনীত রাজা।

৫) কোটাল বা **কটুল** (কোতোয়াল), পুলিশপ্রধান।

৬) সর্দার, সভাপতি।

৭) **কেলিয়াদার** (কেল্লাদার), সুপারিনটেন্ডেন্ট।

৮) কর্তা, মুরবি, মনিব, সোয়ামী (স্বামী), **কামেত** (?), যুদ্ধসেনাপতি ও নগরপতিগণ।

তৃতীয় শ্রেণিতে উঁহারা নির্দিষ্ট করিয়াছেন সেই দেশবাসীদিগের অবস্থান, যাঁহারা উঁহাদিগের ৩৬টি বিশেষ জীবিকাভেদে বিভক্ত, যথা—

১) বৈদ্য, **চিকেৎসক** (চিকিৎসক), **তবিত বা কবিরাচ** (কবিরাজ), ঔষধ প্রস্তুতকারী।

২) **কায়েস্ত** বা **কইতি** (কায়স্থ, কায়েত), নকলনবিশ, মুহুরি।

৩) **বানেমণি** বা **পারকোলাওয়ালা**, কাচের দ্রব্যাদির কারিগর।

৪) **কন্দ** বা **কন্ধ**, ধূপ বিক্রেতা।

৫) **তাম্বুলি**, তরিতরকারি বিক্রেতা।

৬) **মইয়েরা** (ময়রা, মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী বা মোদক)।

৭) সোনা বা সেকরা, ধাতুর গহনার কারিগর।

৮) সংখ্যাটি লেবেদেভের তালিকায় বাদ পড়িয়াছে।

৯) **কোল** (গোয়ালা বা গয়লা), দুগ্ধ বিক্রেতা।

১০) বারই (বারুই), পান বিক্রেতা।

১১) তিলি, কাগজ প্রস্তুতকারী।

১২) **তাইতি** (তাঁতি), বস্ত্রনির্মাতা।

১৩) কামার, লৌহদ্রব্যাদির কারিগর।

১৪) **কুমার** (কুমোর), মৃত্তিকানির্মিত দ্রব্যাদির কারিগর।

১৫) ধোবা (ধোপা), বস্ত্র ধৌতকারী।

১৬) দাস, ভৃত্য।

১৭) নাপিত, শ্মশ্রুকর্তনকারী।

১৮) চাষা, কৃষক।

১৯) কৈবর্ত, সবজিউৎপাদনকারী।

২০) কুরমী, রন্ধনকর্মজীবী।

২১) **কুরনকা,** পশু চিকিৎসক, হাতুড়ে।

২২) **পদ,** লবণপ্রস্তুতকারী।

২৩) **তিয়োর** (ধীবর), মৎস জীবী।

২৪) **কপালী,** রজ্জু প্রস্তুতকারী।

২৫) **কোল** বা **বাইতি** (মাইতি), মাদুর প্রস্তুতকারী।

২৬) কলু, তেলওয়ালা, তৈল প্রস্তুতকারী।

২৭) **বিয়াদগ** (ব্যাধ), শিকারি।

২৮) **বাচিকর** (বাজিগর) বা **বিদি** (বিদূষক), হাস্যকৌতুককারী।

২৯) **চুতার** (ছুতোর), কাষ্ঠদ্রব্যাদির কারিগর।

৩০) **করামি** (ঘরামি), ঘরবাড়ি নির্মাণকারী।

৩১) **কুনরি,** শস্য পরিষ্কারকারী।

৩২) গাবি (হাঁড়ি), আবর্জনা পরিষ্কারকারী, মেথর।

৩৩) মুচি, চামার, চর্মজীবী।

৩৪) **শৌসুনরি,** পানীয় বিক্রেতা।

৩৫) পটুয়া, নিসর্গচিত্রশিল্পী, চুনকাম মিস্ত্রি।

৩৬) **কান,** গায়ক।

চতুর্থ শ্রেণিতে উহাদের ধারণায় রহিয়াছে ''**রেইয়ত লোক বা রাইয়ত লোক**'' নামক কৃষকগণ (হলচালক)।

হিন্দুদিগের পদ ও পদবির বিভিন্নতা সম্পর্কিত সমগ্র আলোচনা হইতে যথেষ্ট লক্ষণীয় বলিয়া ইহাই গণ্য করা যাইতে পারে যে, প্রতিটি শ্রেণি যেইরূপ বিশেষভাবে নিজ উপাধি বা জীবিকায় অভ্যস্ত বা সংযুক্ত যে তাঁহারা স্বেচ্ছায় এক জীবিকার পরিবর্তে অন্য জীবিকা গ্রহণে কভু স্বীকৃত হইতেন না এবং কোনও কারিগর নিজ কর্মস্থান ও কর্ম, যাহাতে তাঁহার পিতা বা পূর্বপুরুষগণ নিযুক্ত ছিলেন, তাহা ছাড়িয়া অপরের কারিগরিত্ব বা পদ গ্রহণ করিতেন না, ব্যতিরেকে পুরাকালের ক্রীতদাস বা অধুনা ধর্মভ্রষ্ট নামান্তরে হাঁড়ি শ্রেণির স্বেচ্ছাজীবী অচ্ছুতগণ (সমাজচ্যুত, জাতিভ্রষ্ট), যাহাদের উৎপত্তি কোনও একটি জাতি হইতে হয় নাই বরং কয়েকটি জাতির ভারত আগমনের ফলে ভিনদেশি বন্দি অথবা নিজ দেশ হইতে বিতাড়িত অযোগ্য মানুষদিগের মধ্য হইতে হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতীয়গণের আচার-ব্যবহার ও প্রথা বিষয়ক

পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে যারপরনাই স্পষ্ট যে, ভারতীয় হিন্দুগণ কিয়দংশেও বর্বরদিগের ন্যায় নহেন এবং তাঁহাদিগের সহিত নির্মম আচরণ যাহারা করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি স্বীয় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিবার সময় উহাদিগকে হিংস্র জন্তু হইতেও অধিক রক্তপিপাসু আখ্যা দিয়া তাঁহারাই অধিকতর সততার পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহারা পৌত্তলিকদিগের ন্যায় নহেন, তাঁহারা ওইরূপ বলিয়া মনে করেন তাহাদিগকেই, যাহারা নিজদিগকে লইয়া অহঙ্কারে ভুগিয়া থাকে, যাহারা আপন সীমাহীন লোভের বশে সমৃদ্ধিসাধনের নিমিত্ত মনুষ্যজাতির দুর্ভাগ্যের সুযোগ লইয়া সমগ্র রাষ্ট্র আত্মসাৎ করিয়া থাকে।

তাঁহারা স্বীকার করেন যে প্রকৃত ঈশ্বর এক এবং ইউরোপীয় বহু জাতির পূর্বে খ্রিস্টীয় কানুন সম্পর্কে তাঁহারা সম্যক অবহিত ছিলেন। পার্থক্য কেবলমাত্র এই যে, অল্পাধিক পৌত্তলিক কুসংস্কারের অংশাবশেষ তাঁহাদিগের মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল, তাঁহাদিগের ভূখণ্ডে অমিত্রসুলভ মন লইয়া বিভিন্ন জাতির ক্রমাগত আক্রমণ ও প্রায় বলপূর্বক মানবিকতাবোধ ভুলিয়া যাইতে বাধ্য করিবার কারণে অদ্যাবধি কেবল তাঁহারাই নহে, অন্যান্য বহুজনই ওইসকল কুসংস্কার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

তথাপি এতৎসত্ত্বেও, তাঁহারা কোণঠাসা ও অত্যাচারিত হইলেও, তাঁহাদিগের সম্মুখে সর্বপ্রকার প্রলোভন আনয়ন করিলেও, নৈতিকতার ব্যাপারে তাঁহাদিগের অনমনীয়তা অনুকরণযোগ্য।

বহিরাগতদিগের নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় তাঁহাদিগের কল্পনা করা মূর্তির রূপ, যাহা বহিরাগতরা বুঝিতে পারে না উহাদিগের আদি ভাষা সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবে, কিন্তু বহিরাগতদিগকে লইয়া হাসিবার অধিকার ভারতীয়দিগেরই অধিক, বহিরাগতরা নিজদিগের স্বাভিক ধর্মের গরিমায় সম্ভবত ভুলিয়া যায় যে, স্বয়ং ত্রাণকর্তাও কাল্পনিক গল্পের মাধ্যমেই শিক্ষা দিয়া থাকিতেন।

পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তি ইতিপূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে উপরোক্ত সকল প্রকার ধর্মীয় আচার ও উৎসবের বর্ণনায়। ঈশ্বরের মহান কীর্তির স্মরণে ও তাঁহাদিগের কৃতজ্ঞতার প্রমাণস্বরূপ এই সকল উৎসব উদ্‌যাপিত হইত।

শপথ করিলে তাঁহারা সর্বতোভাবে তাহা পালন করিয়া থাকেন এবং শপথ করিয়া তাহা ভঙ্গ করিবার পরিবর্তে

তাঁহারা মর্যাদা, সম্পত্তি এমনকি প্রাণ দান করা বাছিয়া লন। নিজের অভিজ্ঞতায় ইহা আমি অনুভব করিয়াছি, যখন আমার সরকার, যিনি আমার গৃহকর্মাদি দেখাশোনা করিতেন, তাঁহার নামে মালি মামলা করিয়াছিল যে তাহার পাওনা চারিটি টাকা তাহাকে দেওয়া হয় নাই, অথচ সেই টাকা তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং খাতায় আমার নিজহস্তে সে কথা লিখিত ছিল, তখন স্বার্থান্বেষী বিচারকের চাপে তাহার সম্মুখে গঙ্গা জলে হাত দিয়া, যেই হেতু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শপথগ্রহণ সাধারণত সম্পন্ন হইয়া থাকে ওই জলে অঙ্গুলি ডুবাইয়া, নির্দিষ্ট বাক্য উচ্চারণ অপেক্ষা সে সম্মত ছিল দ্বিতীয়বার টাকা ক'টি তাহাকে দিতে অথবা বাণিজ্যিক আইনের কঠোর শাস্তি হিসাবে জেলে যাইতে।

পিতামাতা অতীব লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করেন নিজ সন্তানসন্ততিদিগকে নীতিশিক্ষায় শিক্ষিত করিতে না পারিলে এবং বহু বৎসর নষ্ট না করিয়া, শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত সর্বসাধারণের বিদ্যার্জনের জন্য তাঁহাদের যে সকল জায়গা রহিয়াছে, সেই সকল স্থানে প্রেরণ করিয়া থাকেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাধীন পাঠশালায়, যেইগুলি কেবলমাত্র শহরেই নহে এমনকি জনবসতিগুলিতেও যথেষ্ট সংখ্যায় রহিয়াছে।

শিশুরা কঠোর শাস্তির ভয়ে মাতাপিতাকে মান্য করিত ও তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতির সীমা লঙ্ঘন করিতে সাহস করিত না।

এই নিয়ম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীগণের মধ্যে, প্রভু-ভৃত্য ও বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে।

পরন্তু আমরা ইতিপূর্বে যেইরূপ উল্লেখ করিয়াছি যে, যেহেতু জীবৎকালে এক বর্ণের অন্য বর্ণের জীবিকা গ্রহণ করিবার রীতি নাই, সেই হেতু ব্রাহ্মণ ও সমগ্র পণ্ডিতসমাজ আপন সন্তানদিগকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন ধর্মতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অলঙ্কার (শাস্ত্র), দর্শন, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষবিজ্ঞান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখাইতে এই কারণে উঁহাদিগের মধ্যে অন্যান্য বর্ণের তুলনায় অধিক সংখ্যক শিক্ষিত খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব।

এইগুলি প্রমাণ করে যে, ভারতীয় ব্যবস্থা ও চরিত্র কোন প্রকার কুসংস্কারগ্রস্ত লৌকিক কাহিনি বা উপাখ্যান দ্বারা পরিচালিত নহে, বরং উহা উন্মুক্ত ও সুস্থ যুক্তিগ্রাহ্য নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সামরিক পদে অধিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়গণ, যদিও ইউরোপীয়গণ হইতে ভিন্ন পদ্ধতিতে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী স্বীয় সন্তানদিগকে একইরূপভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে সামরিক গুণে গুণান্বিত করিয়া প্রস্তুত করিতেন।

মসিজীবী **কইতিগণ** (কায়েত) তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেন মামলা বা আইনি কারবারে, সেইরূপ **সদোকার লোক** (সওদাগর), অর্থাৎ ব্যবসায়ীগণ নিজ সন্তানদিগকে প্রস্তুত করিতেন অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য জাতির সহিত পারস্পরিক বাণিজ্যকর্মে।

অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত জনগণ সময় থাকিতে প্রত্যেকে পরবর্তী প্রজন্মকে নিজ জীবিকায় ও হস্তকর্মে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেন এবং ইহার মাধ্যমে শক্ত করিয়া তুলিতেন নিজ অবস্থার স্থিতিশীলতা, যাহা হইতে তাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন।

এই বর্ণ বা শ্রেণিগুলির আলোচনার ক্ষেত্রে এই স্থানে ইহাও লক্ষণীয় যে, তাঁহারা প্রত্যেকে চেষ্টা করিয়া থাকেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য জীবিকা সংক্রান্ত সামগ্রিকভাবে দরকারি মন্তব্য জীবিতাবস্থায় লিখিয়া রাখিয়া যাইতে, সেইগুলি একত্র করিয়া একে অপরকে উদাহরণ ও নির্দেশের মাধ্যমে তাঁহারা ক্রমশ উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন।

ভারতীয়গণ রক্তপাত হইতে এইরূপ বিরত যে, কেবলমাত্র জীবজন্তু নহে, এমনকি সরীসৃপ ও কীটপতঙ্গ হত্যাকেও পাপ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, যেই কারণে তাঁহারা কদাপি মাংস, মৎস্য খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেন না, বরং কেবলমাত্র ভূমিজাত ফসল ও ফল আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন।

সাধারণভাবে উঁহাদিগের খাদ্য সিদ্ধ চাউল, ইউরোপীয়দিগের ভাষায় ''রাইস'', সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহারা উহা ঠান্ডা অবস্থায় ভক্ষশ করিয়া থাকেন এবং দ্বিপ্রহরে উহাই ভক্ষণ করিয়া থাকেন গরম অবস্থায় কয়েকটি তিক্ত মশলা ও ফল সহযোগে, পোড়া আমও (মিষ্টি আলু) ভক্ষণ করিয়া থাকেন, যাহা আকৃতি-প্রকৃতিতে আমাদিগের মুলার ন্যায় লাল রঙের কিন্তু মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট। উহা সমুদ্রপথের যাত্রী/নাবিকদিগের দ্বারাও সেইরূপই ভক্ষিত হইয়া থাকে, যেইরূপ ভক্ষিত হয় মাটির নীচের আপেল, যাহার নাম আলু।

প্যাসট্রির পরিবর্তে উঁহারা ভক্ষণ করেন উহাদিগের **''মুতো খন্ড''** নামক স্বল্প মিষ্ট রুটি ও কালো বাতাসা অথবা আমাদিগের মশলাযুক্ত পিঠার মতো খাদ্য।

উঁহারা দিনে দুইবার খাদ্যগ্রহণ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ তিনবার। বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে নির্দিষ্ট উপোস করিবার রীতি উঁহারাও পালন করিয়া থাকেন।

কিন্তু প্রভুত্ব বিস্তারকারী ইউরোপীয়গণ চেষ্টা করিতেছে ভারতীয়দিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে মাংস বিক্রয়ে নিযুক্ত করিতে এবং যদিও ইতোমধ্যে ভারতীয় হিন্দুগণ নহে, তবে মহমেডান (মুসলমান) ও নিচুর শ্রেণির মানুষদিগকে লইয়া জবাইখানা স্থাপন করা হইয়াছিল, যাহাতে এইরূপে তাঁহাদিগকে ইউরোপীয়দিগের সহিত একই প্রকার জীবনধারণে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে পারা যায়, অথচ এই সকল উদ্যোগের ফলে জীবনযাপনে আকাঙ্ক্ষিত সামঞ্জস্য না আসিয়া অধিক দুঃখ ও অব্যবস্থার সূচনা হইয়াছে।

প্রথম যুগ হইতে বসবাসকারী প্রকৃত ভারতীয়গণ খুবই পছন্দ করেন পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্যগ্রহণের পূর্বে ও পরে ॅাহারা মুখ ধুইয়া থাকেন ও প্রতিদিন দিনে দুইবার গঙ্গা নদীতে স্নান করিয়া থাকেন।

তাঁহারা নিজ স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের চিকিৎসকদিগের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু লতাপাতা ও বৃক্ষের রস গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং হাওয়ার পরিবর্তন হইতে নিজ শরীর রক্ষা এবং স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতিবিধির নিমিত্ত নারিকেল তৈল দ্বারা শরীর মর্দন করিয়া থাকেন।

নিজ গৃহে তাঁহারা খালি পায়ে হাঁটেন, লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত কেবলমাত্র শরীরের কিছু অংশ লঘু বেষ্টনী দ্বারা ঢাকিয়া রাখেন, এবং যখন গৃহ হইতে বাহির হন তখন পুরুষদিগের মধ্যে কতকজন লঘু মসলিন দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, কতকজন ওই কাপড়েরই আমাদিগের রুশি ঢিলে হাতাওয়ালা কাফতানের ন্যায় পোশাক এবং পায়ে সোনা, রুপা অথবা রেশমের আংটির ন্যায় পাকানো ছুঁচোলো নাকওয়ালা নাগরাই পরিয়া থাকেন। ভারতীয় মহিলাগণ সাদা ও রঙিন মসলিন বস্ত্র ও পুরুষদিগের ন্যায়ই পায়ে নাগরাই পরিয়া থাকেন। খ্যাতনামা পুরুষদিগের

পত্নীগণ যথেষ্ট সুন্দর করিয়া তাঁহাদিগের মস্তক, হস্ত ও পদযুগল মূল্যবান অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া থাকেন, যাহা কেবল উৎসবের দিনগুলিতে দেখা যায় যখন তাঁহাদিগকে উন্মুক্ত পালকিতে করিয়া জনপথে লইয়া আসা হয়।

মিষ্টান্নপ্রিয় ও স্থূলবপু তাঁহাদিগের মন্ত্রীগণ কদাচিৎ পায়ে হাঁটিয়া থাকেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উঁহাদিগকে হালকা অথচ শক্ত বংশদণ্ডে বাঁধা তোরঙ্গ অথবা পালঙ্কের ন্যায় দুই ধরনের পালকিতে বহন করা হয়। উহাদিগের বারি (বেহারা) নামক বাহকগণ শক্তি এবং চলন কৌশলের দরুন আমাদিগের চালক ও অশ্বদিগের পরিবর্তে থাকে। উঁহারাও কেবলমাত্র একটি কৌপীন পরিয়া খালি পায়ে পথ চলে, যেইরূপ উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

ওই মন্ত্রীবরেরাই যখন গৃহে থাকেন, গরম ও কীটপতঙ্গের হাত হইতে নিষ্কৃতির নিমিত্ত প্রথা অনুযায়ী ওই বেহারাদিগকে বাধ্য করিয়া থাকেন পাখার বাতাস ও হালকা গাত্রমর্দন করিয়া দিতে। ওই ভৃত্যকুলই দিনে একাধিকবার তাহাদিগের পা ধোয়াইয়া দেয়। এইরূপ সেবা করিতে তাহারা এতদূর অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, যদিচ কোন বিদেশি অজান্তে তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাকে উহারা বাবু বলিয়া গণ্য করে না এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিতে তাহার চাহিদা মিটাইতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে।

তাঁহাদিগের ভৃত্যকুল সম্পর্কিত আলোচনায় লক্ষণীয় যে, উহাদিগের মধ্যে কেহই অন্যের কাজ করিতে সম্মত হয় না, সেই কারণে আগত বিদেশিগণ উহাদিগের রীতিনীতি আগ্রাহ্য না করিয়া উহা রপ্ত করিতে এবং বিশেষ কয়েকটি পরিষেবার জন্য সময় থাকিতে বুঝিয়া লইতে বাধ্য। ভৃত্যদিগকে ভাড়া করিবার ও তাহাদিগের উপর নজর রাখিবার নিমিত্ত ভারতীয় ভাষায় সরকার নামক একজন গৃহকর্ম নির্বাহকারী কর্মচারী দরকার হয়। ঐ ব্যক্তিটি স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুধর্মী, কিন্তু অন্যান্য গৃহভৃত্যগণ, উপরিউল্লিখিত পালকিবাহকগণ ব্যতিরেকে, মুসলমানদিগের মধ্য হইতে লওয়া হয়, ইহা হইতে বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না যে, আগত বিদেশিদিগের জীবনযাপনে "সরকার" ব্যক্তিটির প্রয়োজন কতখানি।

মদ্যপান ভারতীয়দিগের এতদূর বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে যে, কেবলমাত্র ফলের রস হইতে প্রস্তুত সাধারণ মদ্য অথবা ভোদকাই নহে এমনকি আঙুর ফল হইতে প্রস্তুত মদ্যও হাঁড়ি শ্রেণি ভিন্ন, উঁহাদিগের মধ্যে কেহই পান করেন না, এইগুলির পরিবর্তে তাঁহারা নারিকেলের জল পান করিয়া সন্তুষ্টি লাভ করেন। ওই জল যতক্ষণ বিশুদ্ধ থাকে, উহা অধিক সংখ্যক ভারতীয়দিগের পক্ষে পান করা কষ্টকর নহে, কিন্তু যদি উহা এক বা একাধিক দিন মুখবন্ধ করা অবস্থায় থাকে তখন উহা সাধারণ মদ্য বা ভোদকার ন্যায়ই কড়া বা উহাদিগকে মত্ত করিয়া তুলিবার পক্ষে উপযোগী হইয়া উঠে।

ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগের সহিত ব্যবসায় রত ইউরোপীয়গণ, যখন নিজ জাহাজে ভারতীয় লশকরদিগকে নাবিক হিসাবে রাখিতে চাহিত, তখন নিজ দালালদিগকে আদেশ দিত তামাকুসেবনের সময় ভারতীয় নাবিকদিগকে ইউরোপীয় সাধারণ মদ্য পান করিতে দিতে, যাহা উহাদিগকে স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক উৎফুল্ল ও শীঘ্র সিদ্ধান্তগ্রহণে ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিত, এমতাবস্থায় প্রায়শই উহারা সম্মত হইত তাহাদিগের পক্ষে লাভজনক নহে এমন সকল প্রস্তাবে, চুক্তি হইয়া যাইবার পর উহা অস্বীকার করা তাহাদিগের পক্ষে যারপরনাই কঠিন হইত, এবং সাধারণত ওই সময়েই ইউরোপীয়দিগের দালালগণ ধূর্তামি করিয়া নির্ধারিত অগ্রিম অর্থ উহাদিগের হস্তে তুলিয়া দিত।

তাহারা বহুলাংশে আফিম মিশ্রিত তামাকু সেবনও করিত, মহিলাগণ নিজেরাও কয়েক প্রকার মাদকদ্রব্য ধিক

পরিমাণে গ্রহণ করিবার ফলে অজ্ঞান হইয়া যাইত এবং কিছু সময়ের জন্য অচেতন অবস্থায় থাকিত।

প্রকৃত ভারতীয়দিগের বৈবাহিক সম্পর্ক সততার সহিত তাঁহাদিগের দ্বারা পালিত হয়, যাহা সম্পর্কে আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিবাহিতা মহিলা বা অবিবাহিতা মেয়েরা কেহই পরপুরুষ প্রবেশ করিলে শান্তভাবে একই স্থানে অবস্থান করেন না বরং অন্যত্র চলিয়া যান এমনকি সর্বসাধারণে বা পারিবারিক উৎসবে তাঁহারা জালে ঘেরা, ভিন্ন বিশেষ অংশে নিজদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, যাহার ফলে উহাদিগের মুখদর্শন সম্ভবপর হয় না।

এতৎসত্ত্বেও, যেই স্থানে বিভিন্ন আগত বিদেশিদিগের অধিক বাস, সেই অঞ্চলগুলিতেই উহাদিগের মহামেডান সম্প্রদায়ের লঘু চরিত্রের নারীদিগের দ্বারা পূর্ণ পতিতালয়গুলি রহিয়াছে, যেইগুলির মাধ্যমে সংক্রামক রোগ বহুকাল ধরিয়া ভারতীয়দিগের কিছু গৃহেও নিঃসন্দেহে প্রবেশ করিয়াছে।

যদিও ভারতীয়গণ, পূর্বে আমরা যেইরূপ বলিয়াছি, যথেষ্ট নরম প্রকৃতির, বিবেকবান, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বাসী, তাহা সত্ত্বেও, তাঁহাদিগের সহিত ব্যবসায়ে রত বিদেশিদিগের নিকট হইতে প্রতারণা করিতে শিখিয়া সেইভাবেই বিদেশিগণের অজ্ঞান্তে তাহাদিগকে ঠকাইতে লজ্জাবোধ করিতেন না।

বিদ্যালয়ের পড়ুয়াগণ ব্যতীত, অপর ভারতীয়দিগের অন্যের দ্রব্য লইবার প্রবণতা বা অপর জাতিকে ঈর্ষা করিবার প্রয়োজন উঁহারা বোধ করিতেন না, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁহাদিগের সহিত বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত বিদেশিদিগকে আমাদিগের রুটি, লবণ ও ফল দিয়া আপ্যায়ন করিবার প্রথার ন্যায় ভারতীয়গণও চাউল, লবণ ও **পোপেলমস** (१) দিয়া হৃদয় উন্মুক্ত করিত ও ছদ্ম রাজনীতিকদিগের ধর্মবিশ্বাসী মন দ্রব করিবার নিমিত্ত "যেই পূজার যেই ফুল" নীতিতে স্বর্ণবৃষ্টি ঘটাইতেও জানিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্ব ভারতের প্রাচুর্য বিষয়ক

সকল বিশ্ববর্ণনাকারীগণ একযোগে স্বীকার করেন যে, পূর্ব ভারত বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে একটি, যাহার সমকক্ষ অন্য কোনও দেশ হইতে পারে কি না সন্দেহ।

সর্বজনস্বীকৃত এই সত্য, নিঃসন্দেহে, বহু পূর্বেই বিশ্বের নিকট উদ্‌ঘাটিত।

এই কারণেই মনে হইতে পারে, একক গবেষকের এইরূপ দুর্বল প্রমাণ দ্বারা উহা সমর্থনের যেন প্রয়োজন নাই।

তথাপি যেহেতু আমি স্থির করিয়াছি আমার দেশবাসীগণের সুবিধার্থে ও সন্তুষ্টির নিমিত্ত উঁহাদিগকে সমস্ত কিছু যাহা আমি সেই স্থানে আমার থাকাকালীন সময়ে লক্ষ করিয়াছি ও যাহা সম্পর্কে উঁহারা প্রত্যেকে খুব সম্ভবত অবগত নহেন, আমি আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি তাহা সম্পর্কে উঁহাদিগকে অবগত করানো যে, কলিকাতাস্থিত ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে, সাড়ে তিন দিনের যাত্রাপথের দূরত্বে প্রাক্তন রাজা তিলক চন্দ্রের রাজ্য অবস্থিত, যাহার বিস্তৃতি ১২ দিনে অতিক্রমণযোগ্য, যাহা হইতে কোনও একসময়ে তিনি বছরে ২৩ লক্ষ টাকা পাইতেন, কিন্তু আসল বাৎসরিক আয় যাহা পূর্বেও ধরা হইত ৮০ লক্ষ হইতে ১ কোটি টাকা।

১৭৬০ সালে কাসিম আলি খান তাঁহার মালিকানাভুক্ত সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালো জমি ও বসতিগুলি ইংরেজ ব্যবসায়ীদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ওই জমি বা অঞ্চলের প্রধান শহরগুলি যথা **বর্তমান**, লোকমুখে বর্ধমান, **কিরপি**, **রিয়াদনা কোর**, **বালিশাকর**, **দিভান কঞ্চ** (দেওয়ানগঞ্জ) হইতে উপরোক্ত কোম্পানির জন্য তুলা ও রেশমের বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের বিপুল জোগান আসিত।

প্রাচীনকালে বর্ধমান প্রধান বসতি ছিল, ইদানীং ইংরেজগণ চেষ্টা করিতেছে সেটিকে পুনরায় সেই অবস্থায় লইয়া যাইতে এই কারণে যে ওই শহর দিল্লি, আগ্রা, পারস্য এবং অন্যান্য বিভিন্ন দূরবর্তী দেশ হইতে ধনী ব্যবসায়ীগণ যেমন ইউরোপীয় তেমনই প্রাচ্য দেশীয় সামগ্রী যথা টিন, সিসা, তামা, পশমি কাপড়, জায়ফল, মরিচ, আফিম, সোরা/যবক্ষাকর ইত্যাদি কিনিতে আসিত।

প্রাচীনকালে, ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত রাজা **কোপাল সিংহ**-র (গোপাল সিংহ) পরিবারের নামে বর্ধমান শহরের

দক্ষিণ দিকের কিছুটা উত্তরে একটি রাজ্য, জমির উত্তম অবস্থান, সুষ্ঠু আইনব্যবস্থা ও সজ্জন ব্যক্তিদিগের বাসস্থান হিসাবে যেমনি ইতিহাসখ্যাত তেমনি সমগ্র বিশ্বের নিকট উদাহরণস্বরূপ ছিল।

এই ভূখণ্ডের বিস্তৃতি ১০ দিনে অতিক্রমণযোগ্য এবং উহা হইতে বাৎসরিক আয় হইত ৩০-৪০ লক্ষ টাকা।

এই রাজ্যের প্রধান শহরের নাম **বিস্তনব পর**, লোকমুখে **বিষনিয়া পর** অথবা **বিষ্ণুপুব** (বিষ্ণুপুর) যেই স্থানে রাজার বাসভবন ছিল। বিষ্ণুপুর বলিতে বুঝানো হইয়া থাকে সকল রাজ্যগুলিকে যেগুলি **শক্ত চোরেল** বা **চোয়াল** (চারুল) নামক ওক গাছ, রবার ও কাঁচা রেশম ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ।

বিষ্ণুপুরের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী অঞ্চলে রহিয়াছে প্রাক্তন রাজকুমার **বদদিয়ার চামা খানের** রাজ্য, যিনি মোগল ও **বীরবগিনেব** (বীরভূম) রাজপুত্র আসতুল্লা খানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী, যিনি ভারতীয়গণের নিকট বীর সিংহ রায় নামে পরিচিত ছিলেন।

সমগ্র রাজ্যের মধ্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি অবস্থিত ছিল **বীরবগিন** (বীরভূম) ও **পরিনিয়ার** (পূর্ণিয়া) উচ্চ পর্বতগুলির মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত সীমাহীন প্রান্তরে, এবং সম্রাট বদদিয়ার বা বদিয়ার চামা খানের বাসস্থান **নাকব** শহরের দুর্গ, বেচাকেনার কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হইত।

খালকতি (কলিকাতা) হইতে উত্তর-পূর্বে তিন দিনের দূরত্বে রাজা **কৃষতেন চন্দব** যিনি সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় **কিষেণ চন্দ** (কৃষ্ণচন্দ্র)-র দুর্গ ও রাজ্যের প্রধান শহর **কৃষ্ণনকব** (কৃষ্ণনগর) শহর অবস্থিত।

এই রাজার রাজ্যের বিস্তৃতি অতিক্রম করা যায় ১২ দিনে এবং তিনি ইংরেজ বণিকদিগের কোম্পানিকে বাৎসরিক ৯ লক্ষ টাকা দিতেন, কিন্তু তাহার রাজ্য হইতে আদায়িকৃত রাজস্বের পরিমাণ তৎকালেও ২০ লক্ষ টাকা ধরা হইত।

এই রাজ্যের প্রধান শহরগুলির মধ্যে **শন্তিপর** বা শান্তিপুর, নদিয়া, **বরিন** (?) ইত্যাদি। এই শহরগুলি গমে সমৃদ্ধ, এবং ওই শহরগুলি হইতে ইউরোপিয়ানদিগের জন্য বিপুল পরিমাণে পট্টবস্ত্রের বিভিন্ন জিনিস ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ হইত।

ঢাকা শহরে যেই স্থানে পূর্বে উল্লিখিত বাংলার সজ্জন রাজাধিরাজ শকাদিত্যের প্রধান বাসভবন ছিল, সেই অঞ্চলে সমগ্র ভারতের মধ্যে সমস্ত ধরনের উত্তম মসলিন বা মলমল কাপড়, কাগজ হইতে প্রস্তুত নানা ধরনের বিপুল পরিমাণ অন্যান্য পট্টবস্ত্র, রুমাল ও মোজা ইত্যাদির প্রাচুর্য ছিল, এই শহরে ইংরেজ বণিকদিগের শুল্ক বিভাগ প্রতি বৎসর ভূমিশস্য ও অন্যান্য দ্রব্য হইতে কম করিয়া ২ কোটি টাকা শুল্ক আদায় করিত গম, চাল, তামাক, পানপাতা, সুপারি, বিভিন্ন প্রকার তৈল ইত্যাদি ও তদুপরি ইউরোপ হইতে আমদানিকৃত রেশম ও কাগজের দ্রব্যাদি হইতে সেই স্থানে তাহাদিগের আয় হইত।

প্রাক্তন **বেনগাল্স** (বাংলা) ও **বাগার** (বিহার) প্রাচীনকালে যথেষ্ট বড় রাজ্য ছিল, বর্তমানে সেগুলি "প্রভিন্স" নামে পরিচিত। ইতিহাসে পারদর্শী ইংরেজগণ অবগত ছিল যে কোনও একসময়ে পৃথিবী বিখ্যাত এই বণিকগণ প্রতি বছর ১১ কোটি টাকা বা ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার স্টারলিং পাউন্ড পাইত, কিন্তু বর্তমানে ওই অঞ্চল হইতে তাহাদিগের কত আয় হইয়া থাকে, তাহা কেবলমাত্র উহাদিগের মন্ত্রীগণই জানেন।

সেইরূপই প্রাক্তন রাজ্য **ওড়িষা** বা **ওড়িসা** (উড়িষ্যা) প্রভিন্স হইতে উহাদের বাৎসরিক আয় উপরি উল্লিখিত

দুইটি রাজ্য হইতে কম তো নহেই বরং অনুমান করা হয় যে তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

কলিকাতার উত্তর-পূর্বে দশ দিনের যাত্রাপথের দূরত্বে **নাটুব** (নাটোর) শহর অবস্থিত, সেস্থানে বাঙালি পদাবিধারী রাজপরিবারদিগের মধ্যে সর্বপুরাতন ও সর্বশক্তিমান ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত রাজা **রাম কন্ঠ** (রামকণ্ঠ) বাস করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হন তাঁহার স্ত্রী ভবানী রানি, মন্ত্রী দীনরাম ছিলেন তাঁহার দেওয়ান অর্থাৎ রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল (রানি ভবানীর রাজ্যের পরিধি ছিল ৩০ দিনের যাত্রাপথের সমান, যাহা হইতে তাঁহার বাৎসরিক আয় হইত ৭০ লক্ষ সিকি টাকা)।

তাঁহার মালিকানাধীন মালদা, **গড়িয়াল**, **শিবপর** বা শিবপুর ও **কোগমারী** ইত্যাদি প্রধান শহরগুলি বিভিন্ন শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। কোথাও তুলোট কাগজ হইতে রুই বা **কোপস** (কার্পাস), বিভিন্ন শণবস্ত্র, ইউরোপীয় বাজারের জন্য পটচুল, **শুশি** বা **সুসি**, চট, এলাচি **শিরশতি**, বাফতা, মুলমল, কেনচিস ইত্যাদি তৈয়ারি হইত, ওইগুলির মধ্যে বহু জিনিসই ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশ হইতে আগত ব্যবসায়ীগণ ক্রয় করিয়া **বুসর**, **মাকাও**, **পেগু** (বাগো), **আশিন**, **মালোগ** এবং অন্যান্য শহরে লইয়া যাইত।

বভানীকঞ্চ (ভবানীগঞ্জ), **শিবকঞ্চ** (শিবগঞ্জ), **স্বরূপকঞ্চ** (স্বরূপগঞ্জ), **চমালকঞ্চ** (জামালগঞ্জ) শহরগুলিতে গমের প্রাচুর্য ছিল।

উপরিউল্লিখিত রানি ভবানীর রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে কেরানি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রাক্তন রাজা **প্রাণ নাট** (প্রাণনাথ) যাহার নামের অর্থ **মনের মতো বাদাম** (সম্ভবত বিদেশি লেবেদেভ নাথকে ''নাট'' শুনেছেন এবং নামের অর্থ করেছেন মনের মতো বাদাম—অনুবাদক), তাহার মালিকানাধীন জমিজায়গা রহিয়াছে যাহার বিস্তৃতি ৫০ দিনের যাত্রাপথ। উক্ত রাজার রাজ্যে গম, বিভিন্ন ধরনের তৈল, রেশম ও পট্টবস্ত্র, চিনি, বিভিন্ন প্রকার ফলের প্রাচুর্য ছিল।

ওই রাজ্যের প্রধান শহর রঙ্গপুর, কুরা কাত ও প্রধান বাসভবন **সান্তোষ বদাল**।

উপরোক্ত মালিকানা ব্যতিরেকে আরও বহু সমৃদ্ধ ও বিখ্যাত শহর রহিয়াছে যথা: পাটনা, **লকনো** (লখনউ) রাচমগল (রাজমহল), **কশিম** বা **কসিম** বাজার (কাসিমবাজার), **কোটভা** (কাটোয়া), **মির্চা**, **বকশি** অথবা বক্স বন্দির, আচিম কঞ্চ, বাকের কঞ্চ (বাহারগঞ্জ), মিদ্নাপুর (মেদিনীপুর), চিটাকন (চিটাগঞ্জ বা চট্টগ্রাম), রাচ পুর (রাজপুর) ইত্যাদি। মালাবার, করমণ্ডল ও বোম্বের সম্পদের কথা না ধরিয়া, অন্যান্য সকল স্থানও ভূমিজাত ফসল ও মহার্ঘ দ্রব্যাদিতে সমৃদ্ধ ছিল।

তদুপরি সমগ্র ভারত সমৃদ্ধ ছিল—

প্রথমত যথেষ্ট দুষ্প্রাপ্য, উপকারী এবং আমাদিগের দেশে জন্মায় না এমন বৃক্ষ, যথা:

১) পামজাতীয় গাছ, ভারতীয় ভাষায় খেজুর গাছ, যেটির পুরুষ গাছ হইতে খেজুর ও নারিকেল ফল জন্মায়, যাহা আকারে ও মাপে মানুষের মস্তকের ন্যায়, ছোট-বড় মাপের ছোবড়াবৃত স্ত্রীজাতীয় পাম গাছ হইতে কেবলমাত্র খেজুরই পাওয়া যায়, যাহা ধারালো পাতার ন্যায় ছালযুক্ত হয়। নারিকেলের উপযোগিতা চারি প্রকার—শক্ত খোলা কাটিয়া তৈয়ারি হয় সুন্দর পেয়ালা ও অন্যান্য পাত্র, শাঁস হইতে পাওয়া যায় ব্যবহারযোগ্য নারিকেল তেল, নারিকেলের জল বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয় ও অত্যন্ত উপকারী পানীয়।

২) **চাক** (সম্ভবত জ্যাক ফ্রুট বা কাঁঠাল—অনুবাদক) নামক গাছ হইতে আকারে ও ওজনে আমাদিগের কুমড়ার ন্যায় সবুজ পার্শ্ব ও অমসৃণ বল্কলযুক্ত ফল পাওয়া যায়, যেটির ভিতরে সাদা মিষ্ট কোয়া পরপর বিন্যস্ত থাকে এবং প্রতিটি কোয়ার ভিতরে একটি করিয়া বাদাম গাছের ফলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের আস্তরণযুক্ত সাদা বীজ থাকে।

৩) ভারতীয়গণের নিকট যেটি আম, সেটি বিদেশিগণের নিকট "ম্যাঙ্গো" নামে পরিচিত। এই গাছ হইতে লম্বাটে, সবুজ বা লালচে হলুদ রঙের, বিভিন্ন ধরনের অবর্ণনীয় উত্তম স্বাদবিশিষ্ট উপকারী শাঁস পাওয়া যায়, যেগুলির প্রতিটির ভিতরে একটি করিয়া লম্বাটে খয়েরি রঙের আস্তরণযুক্ত সাদা বীজ থাকে।

৪) বাদাম গাছের কতিপয় শাখা যথেষ্ট লম্বা হয় এবং সেইগুলিতে অ্যামন্ডের ন্যায় সুস্বাদু ফল হয়।

৫) **কোলাপ** (গোলাপ) গাছ হইতে **চাপুল**, কথ্য ভাষায় চাফুল নামক ফুল ও গোলাপি রঙের ফল পাওয়া যায় (?)।

৬) পান গাছের ফল সুপারি (?) হইতে থান কাপড় রাঙাইবার জন্য উৎকৃষ্ট লাল রং পাওয়া যায়, ভারতীয় ও ভারতে জন্মগ্রহণকারী পর্তুগিজগণ পানপাতায় গুঁড়া চনের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইয়া থাকে সুপারি, যাহার অর্থ হইল **"মধ্যদিনে পক্ক"** (?)।

৭) **মালিকা** (মল্লিকা) নামক ফুল ও সুগন্ধযুক্ত গাছ ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার গাছ।

চারুল নামক সাদা ও লাল চন্দন গাছ, ও অন্যান্য বহু প্রকার ফল ও ফুলের গাছ।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের ফুল, রোগ নিরাময়কারী ও ফলদায়ী লতাগুল্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যথা:) তুঁত, যাহা হইতে নীল রং পাওয়া যায়, ২) রুই (কার্পাস), যাহা হইতে তুলা উৎপন্ন হয়, ৩) **লনিমনসা** (ফণীমনসা) মাছিরা যাহা খাইয়া থাকে, যাহা হইতে বস্ত্র রং করিবার জন্য লাল রং **কাচেনীল** (?) তৈয়ারি হয়, ৪) লতাগুল্ম, যাহা হইতে সাবান তৈয়ারি হয়, ৫) রেশম পোকার ভক্ষণযোগ্য লতাগুল্ম ও ইক্ষু, যাহা হইতে মিছরি ইত্যাদি পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত শস্যদায়ী ফসল ধান, গম ইত্যাদি।

চতুর্থত মুখ্যত মহার্ঘ পাথর, মুক্তা, স্বর্ণ-রৌপ্য খনি, যেগুলির বিস্তৃত বর্ণনার স্থান ইহা নহে।

পঞ্চমত বিভিন্ন ধরনের মসলিন, যথা—সাদা ও রঙিন মসৃণ কাপড়, রুপা, রেশম ও সোনার সুতা দ্বারা নকশা করা মসলিন, যাহা মলমল নামে পরিচিত ও বাফতা প্রভৃতি।

ষষ্ঠত বিভিন্ন প্রকার পশু, যাহাদিগের মধ্যে বিশেষত ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, মহিষ, হরিণ, শৃগাল ও বৃহদাকৃতির শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের হস্তী।

সপ্তমত বিভিন্ন প্রকার হিংস্র, সুন্দর ও অদ্ভুত পক্ষী।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতীয় বাণিজ্য বিষয়ক

ভারতীয় বাণিজ্য, উহার বিস্তৃতির দিক হইতে সামগ্রিক ব্যবসাবাণিজ্যের জননী হিসাবে সর্বদা গণ্য হইতে পারে।

ভারতের নিজস্ব পণ্য ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানির পরিবর্তে সেই সকল দেশ হইতে উহাদিগের উৎপাদিত অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানিই ছিল ভারতীয় বাণিজ্য।

নিম্নলিখিত জাতিগুলি ভারতীয় বাণিজ্যের সহিত যুক্ত ছিল—

১) ইংরেজ, যাহারা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। উহারা যাহা ভারতে আমদানি করিত তাহার অধিকাংশই রাশিয়া হইতে পাওয়া সামগ্রী, যাহা তাহাদের মতে "রাশিয়ান বের" বা রাশিয়ান ভল্লুকের মতোই আটপৌরে, কর্কশ। ইংরেজগণ ফ্রেঞ্চদিগকে যেমন ফরাসি কুকুর "ফ্রেঞ্চ ডগ" বলিত, রাশিয়ানদিগকেও অশিক্ষিত ধরিয়া অবজ্ঞার সহিত "রাশিয়ান বের" নামে ডাকিত। আমদানিকৃত সামগ্রী যথা: পালের কাঠ, চেরা কাঠ, দড়ি তৈরি করিবার উপযুক্ত লতাগুল্ম, শণ, পাল তৈরির কাপড়, পশুচামড়া, আলকাতরা, চর্বি, লৌহপাত ও ফালি, ইস্পাত, পেরেক, মাছের ডিম, ক্র্যানবেরি, কাউবেরি এবং নিজস্ব শিল্পের পণ্য, যথা: বিভিন্ন ধাতু হইতে নির্মিত দৈনন্দিন ব্যাবহারিক সামগ্রী, পশমি কাপড়, রেশম ও পট্টবস্ত্র, জুতা, উঁচু জুতা, শুয়োরের শরীরের বিভিন্ন অংশের মাংস, পনির ও বিভিন্ন ধরনের সস, বিভিন্ন ধরনের বিয়ার, লাল ও সাদা আঙুরের মদ্য, আরক, রম, ফ্রেঞ্চ ভদকা, বাদাম, নাম খোদাই করা কার্নিশ, সালমন মাছ ও অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রী।

২) ফরাসি, ভারতে প্রভুত্ব বিস্তারকারী দ্বিতীয় জাতি, যাহাদিগের ঘাঁটি ও শাসন এলাকা ছিল চন্দননগর, পন্ডিচেরি ও মওরে (Moure)*।

উহারা ভারতে আমদানি করিত বিভিন্ন ধরনের আঙুর ফলের রস হইতে মদ্য, বিশেষত শ্যাম্পেন, ব্র্যান্ডি, লাল ও সাদা টেবিল ওয়াইন, ফ্রেঞ্চ ও অন্যান্য ভদকা, মিষ্ট স্বাদুক্ত লিকার, কিশমিশ, আলুবোখরা, সিল্কের মোজা ও বিভিন্ন ধরনের কাপড়, দৈনন্দিন ব্যাবহারিক সামগ্রী, ভেরমিশেল, ম্যাকারোনি ইত্যাদি।

৩) পোর্তুগিজগণ, যাহারা পূর্বে ভারতের স্বশাসক হিসাবে থাকিলেও বর্তমানে উহাদিগের দখলে কেবলমাত্র ব্যান্ডেল নামক প্রায় জনশূন্য একটি স্থান, তাহারা বিভিন্ন প্রকার পোর্তুগিজ মদ্য (ওয়াইন), খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য বহু জিনিস আমদানি করিত।

৪) ওলন্দাজগণ, পোর্তুগিজদিগের পূর্বসূরি, চুঁচুড়ায় যাহাদিগের ঘাঁটি ও বসতি ছিল, তাহারা লিখিবার কাগজ, মাটির বাসন, মসৃণ ও কাজ করা তামাক খাইবার নল (পাইপ), তৈলাক্ত হেরিং মাছ, বিভিন্ন ধরনের পনির, স্মোকড্ মাংস ও সালামি, বাটাভিয়ান আরক ও রম, সুতা ও দড়ি আমদানি করিত।

৫) ওলন্দাজদিগের পূর্বসূরি ডেনমার্কের অধিবাসীগণ, যাহাদিগের ঘাঁটি ছিল শ্রীরামপুর, তাহারা আমদানি করিত ডেনিশ লাল মদ্য, বিয়ার, বিভিন্ন ধরনের ভদকা, পনির, হেরিং মৎস্য, রাশিয়ার মৎস্যের নোনা ডিম, ক্র্যানবেরি, কাউবেরি, পালের ক্যানভাস ও দড়ি, রেসিন বা টার, আলকাতরা ইত্যাদি।

৬) সুইডিশ, আমাদিগের (রাশিয়ার) নিকট প্রতিবেশী, আমদানি করিত লৌহপাত ও লৌহনির্মিত দ্রব্য, তাম্র, বন্দুক, তালা, বিভিন্ন ধরনের ভাঙাচোরা লোহার জিনিস ও স্ব-উৎপাদিত ও বিভিন্ন ধরনের রাশিয়ার সামগ্রী।

৭) আমেরিকানগণ, যেইরূপ স্বদেশে, সেইরূপ ভিন দেশে উৎপন্ন ফসল ও দ্রব্য আমদানি করিত।

ভারতে আগত এই সকল জাতির জাহাজ নিজদিগের সামগ্রী নামাইয়া দিত শস্যাগারে বা গুদামে, যেইগুলি বানানো হইয়াছিল বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া ও প্রথমে উহারা সেই সকল সামগ্রী অধিক মূল্যে বিক্রয় করিত সর্বসাধারণের জন্য নিলাম ডাকিয়া, অবশিষ্ট সামগ্রী নিলামের পর সুবিধানজক মূল্যে দিয়া দিত নিজদিগের দালালদিগকে, যাহারা উহাদিগের নিকট হইতে অর্থের অথবা ভারতীয় সামগ্রীর বিনিময়ে তাহা কিনিয়া লইয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া ওই সকল সামগ্রী বিভিন্ন দেশে, যথা—চিন, আফ্রিকা, আমেরিকা, স্পেন, পোর্তুগাল ও অন্যান্য দূরবর্তী দেশগুলিতে লইয়া যাইত এবং ফিরিবার পথে ওই সকল দেশের খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী কিনিয়া আনিত। দালালের পদ সাধারণত গ্রহণ করিত ওই সকল ইউরোপীয়গণই অথবা নিলামে অংশগ্রহণকারী বা পুঁজিসম্পন্ন আর্মেনিয়ান বা ভারতীয়গণ।

পরন্তু, নিঃসন্দেহে, সকলেরই জ্ঞাতব্য যে, নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছাইবার অনুকূল মরশুমি হাওয়া, যাহা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দিক পরিবর্তন করিয়া থাকে, তাহা নাবিকদিগের নিকট কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, সেই হেতু ফিরতির জাহাজগুলি একটি হইতে অপরটিকে লাভজনক গণ্য করিয়া ওই সময় স্বাধীন ব্যবসায়ী বা দালালদিগকে পড়িয়া থাকা অবিক্রীত সামগ্রী আসল মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করিত, তথাপি ক্রেতাগণের যারপরনাই লাভ হইত এবং বিশেষত প্রথম জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে অন্য ব্যবসায়ীগণ, যাহাদিগের ওই সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হইত, তাহারা কিনিবার জন্য আসিয়া ভিড় করিত।

সহৃদয় দেশবাসীগণ, ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া কষ্টকর নহে যে, আমরা কী পরিমাণ লাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছি আমাদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিদেশিদেগর মারফত এত হাত ঘুরিয়া আমাদিগের হাতে পৌছাইবার ফলে।

তৃতীয়, শেষ অধ্যায়ের সমাপ্তি।

---

* মওরে (Moure)- পোর্তুগালের একটি অঞ্চল।

লেবেদেভের জীবনের উল্লেখযোগ্য তারিখের তালিকা

১৭৪৯- গেরাসিম লেবেদেভের জন্মসাল। তাঁর জন্ম ইয়ারোস্লাভলের এক যাজক পরিবারে। যখন তাঁর বয়স পনেরো তখন তিনি পিটার্সবার্গে চলে আসেন তাঁর বাবার কাছে, যিনি রাজসভার চ্যাপেলের গায়ক ছিলেন। যে কারণটি তাঁর বাবাকে রাজধানীতে চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, লেবেদভের কথায় তা "জোর করে তাঁকে কোণঠাসা করা"। ছেলেবেলায় মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকায় তাঁকে পড়াশোনা করতে হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষায় ও ঘটনাক্রমে সঙ্গীতশিল্পে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন পিটার্সবার্গ আসার পর, বিশেষত ভেলানচেলি বাদনে তিনি দক্ষতা অর্জন করেন।

১৭৭৭- কাউন্ট রাজুমভস্কির নেপোলিতে দূত হিসাবে নিয়োগের কারণে দূতাবাসের সঙ্গে রাশিয়া ত্যাগ। বাভারিয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ায় যুদ্ধ বাধায় দূতাবাসের কর্মচারীরা ভিয়েনায় আটকে পড়েন, কনসার্টের মাধ্যমে রোজগার করে সেখান থেকে লেবেদেভ ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

১৭৮৫ (অগাস্ট)-১৭৮৭- মাদ্রাজে জীবন কাটান। নগরপাল ডব্লিউ. সিডহ্যাম তাঁর সঙ্গে দু'বছরের চুক্তি করেন, সেই চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজ সমাজকে আনন্দ দেবার জন্য কনসার্টের আয়োজন করলে লেবেদেভ টিকিট বিক্রির টাকার ওপরে আরও ২০০ পাউন্ড বছরে মাইনে পেতেন।

১৭৯৫ (২৭ নভেম্বর)- প্রথম নাটকের প্রযোজনা ২৫ নং ডোমতলা লেনের বাড়িতে (বর্তমানে ২৭ নং এজরা স্ট্রিট) তাঁর নিজের তৈরি থিয়েটারে। বাংলা ভাষায় "কাল্পনিক সংবদল" কমেডিটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। নাটকটির সাফল্য সম্পর্কে লেবেদেভ লন্ডনকে জানিয়েছিলেন: "এত লোক সমাগম হয়েছিল যে, আমার থিয়েটার যদি এর তিনগুণ বড় হত তাহলেও তা ভর্তি হয়ে যেত।"/ঐতিহাসিক মহাফেজখানা..., পৃঃ ১৭০।

১৭৯৬ (২১ মার্চ)- "কাল্পনিক সংবদল" নাটকটির দ্বিতীয় প্রযোজনা।

১৭৯৭ (২৫ নভেম্বর)-ভারত থেকে ইউরোপ যাত্রা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজ "লর্ড টারলয়" করে, যার ক্যাপ্টেন ছিলেন ভ. টম্পসন।

১৭৯৯ (মার্চ)-লন্ডন আগমন, যেখানে তিনি প্রায় দু'বছর ছিলেন। এখানে থাকার সুযোগে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেন কলকাতার হিন্দুস্থানি ভাষা ব্যাকরণ / Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects with dialogues affixed... By Gerasim Lebedeff. London. 1801.

১৮০১-স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৮০২ (৪ ফেব্রুয়ারি)-আলেকজান্ডার প্রথম, তাঁর নামাঙ্কিত নির্দেশপত্রে লেবেদেভকে বিদেশ দফতরের প্রাচ্য বিভাগীয় কলেজের অবধায়কের পদে বছরে ১৮০০ রুবল বেতনে চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণের নির্দেশ দেন (সেই বছরই বিভাগটির নাম পালটে করা হয় বিদেশ মন্ত্রক)।

১৮০৫-"পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্ম, পবিত্র ধর্মীয় রীতিনীতি ও লোকাচার সংক্রান্ত নিরপেক্ষ পর্যেষণা"-বইটির প্রকাশ।

১৮১১-লেবেদেভ রাজসভায় উপদেষ্টার পদ লাভ করেন।

১৮১৭ (১ জানুয়ারি)-সেন্ট ভ্লাদিমিরের নামে ৪র্থ শ্রেণির পদকলাভ।

১৮১৭ (১৫ জুলাই)-লেবেদেভের মৃত্যু। গিয়োর্গির নামে কবরস্থানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। তাঁর কবরটি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, সমাধিফলকের একটি মার্বেলের টুকরোমাত্র রয়েছে, যাতে কবিতায় তাঁর ভারতভ্রমণ ও ভারতীয় ভাষা শেখার উদ্যোগের কথা লেখা আছে:

...রুশ দেশের সন্তানদের মধ্যে সে প্রথম
পূর্ব ভারতে প্রবেশকারী।
এবং, ভারতীয়দের নৈতিক আচরণের তথ্য সংগ্রহ করে
রাশিয়াতে তাদের ভাষা আনয়নকারী...

এই সমাধিলিখনের কথাগুলো প্রথম প্রকাশিত হয় পিটার্সবার্গে সমাধিস্থ মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য নির্দেশিকায়। সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১৯১২, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬২৪।

লেবেদেভ সম্পর্কে প্রকাশিত রচনার তালিকা বাংলা ভাষায়

ঘোষ চ.র., গেরাসিম লেবেদেভ। কলকাতা, ১২০ পৃঃ।
মামুদ হায়াত্। গেরাসিম লেবেদেভ। ঢাকা, ২০০৭।

ইংরেজি ভাষায়

Alaev L. B., Vapha A. K. Indology (History, Economy and Culture). Moscow, 1968.
Das Gupta R. K. G. S. Lebedeff: the founder of the Bengali theatre/ Indian Literature, 1963, vol. 6, No. 1.
Gamayunov L. S. Gerasim Levedev. The founder of Russian Indology.. Central Assian Review. 1963, No. 11.
Grierson George A. The early English theatre and Bengali drama (A suppliment)/ Calcutta Review. 1923, October.
Levin G. B., Vigasin A. A. The image of India. Moscow. 1984.
Mamud H. Gerasim Stepanovich Lebedev. Bangla Academy. Dhaka. 1985.
Mookerjee, Mohini Mohan. Early history of the Bengali stage/ Calcutta Review. 1923, December.
Nair (P. T) Lebedeff's life in Calcutta in his grammar (1801), reprinted in the 3-d enlarged edition. Calcutta 1988: Sen, Dipankar. Seria Calcutta: The man who produced the first Bengali play (Gerasim Lebedeff)/ Calcutta Municipal Gazette. 1978, September 10 and November 4.
Shastitko P.M. Russia and India. Calcutta, 1991.

রুশ ভাষায়

Антонова К. А. К истории русско-индийских культурных связей. Из тетрадей Г.С. Лебедева (1795 1797)//Исторический архив.М. 1956. № 1.

Булгаков Ф.Н. Герасим Степанович Лебедев русский путешественник, музыкант в Индии в конце XVIIIв.// Исторический вестник. СПБ., 1880.

Воробьев-Десятовский А. Д. Русский индианист Герасим Степанович Леведев (1749-1817)//Очерки по истории русского востоковедения. М., 1956.

Воробьева-Десятовская М. И. Г.С. Лебедев// История отечественного востковедения до середины XIXвека.М., 1990.

Гамаюнов Л.С. Из истории изучения Индии в России (к вопросу о деятельности Г. С. Лебедева)// Очерки по истории русского востоковедения. М., 1956.

এই তালিকায় সেই সমস্ত লেখকের রচনার উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা তাঁদের রচনায় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিল ব্যবহার করেছেন।

জ. ফ্রেজর

চিৎপুর রোডের বাজার
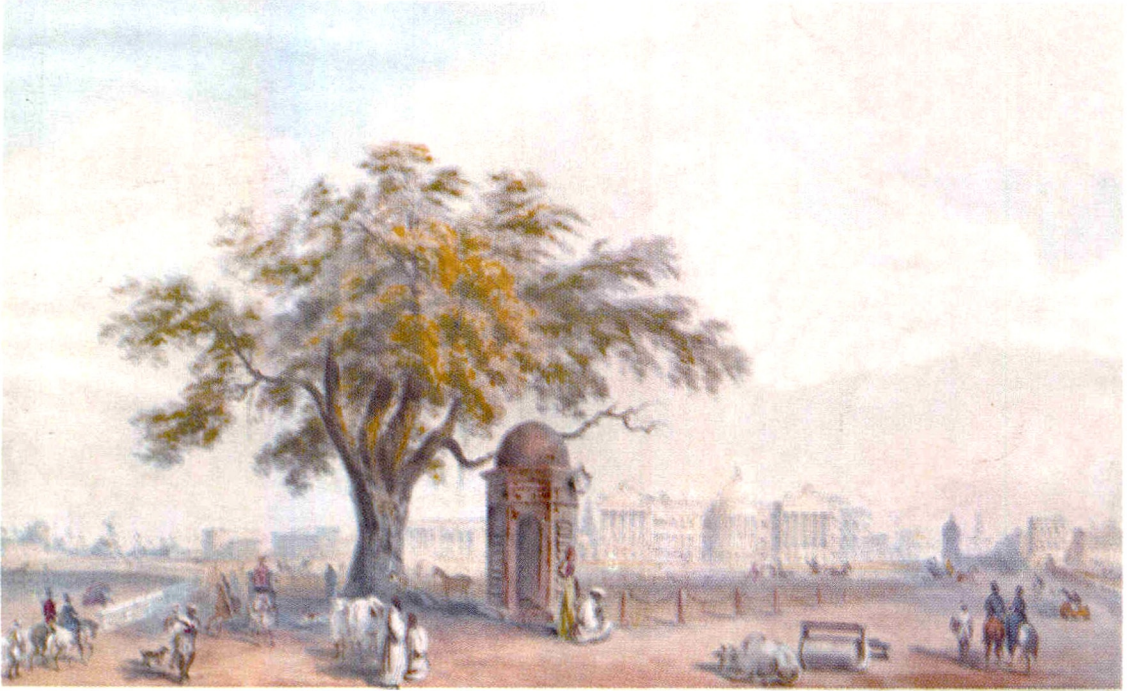
চ. ডয়লি

পুরোনো শহরের দিক থেকে কলকাতার দৃশ্য

ট. ড্যানিয়েল চিৎপুর রোড
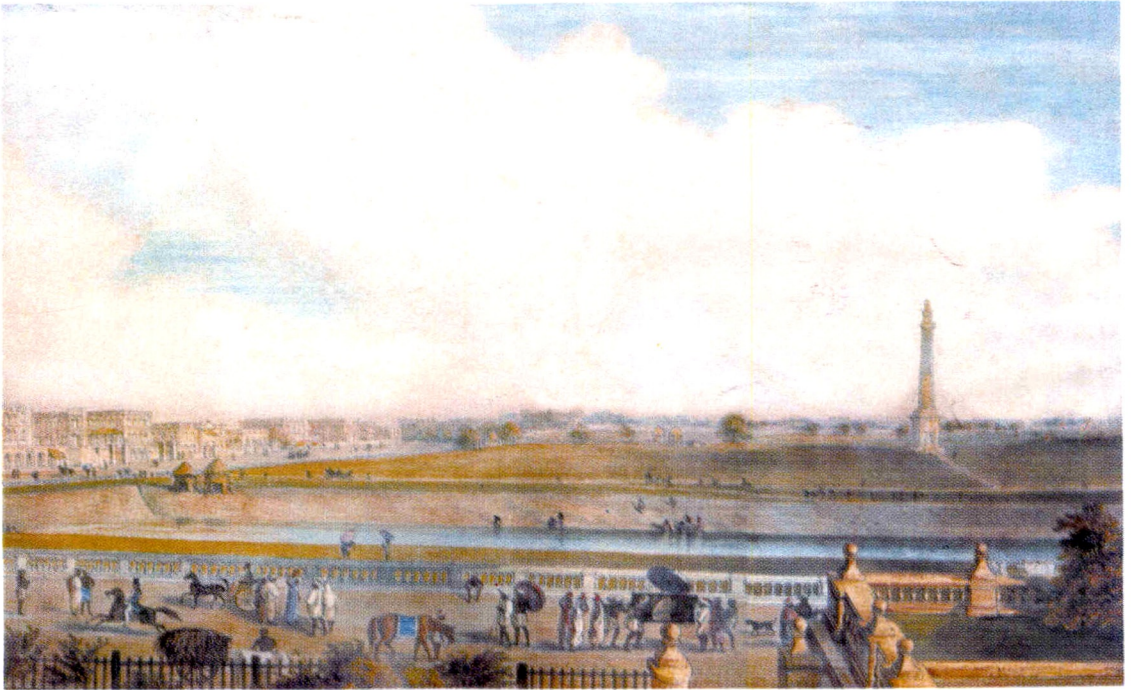
চ. ডয়লি এ্যাসপ্লেনেড থেকে দেখা চৌরঙ্গী

চ. ডয়লি

শুল্ক জেটিঘাট
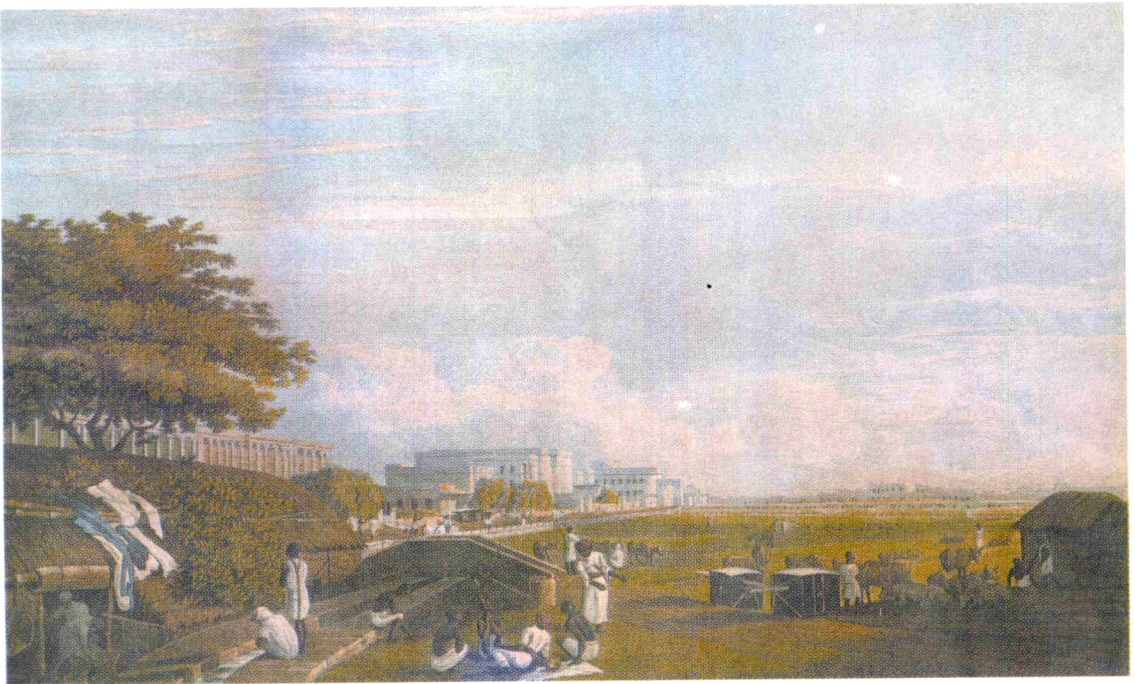
জ. ফ্রেজর

চাঁদপালঘাট জলাশয় থেকে এ্যাসপ্লেনেডের দৃশ্য
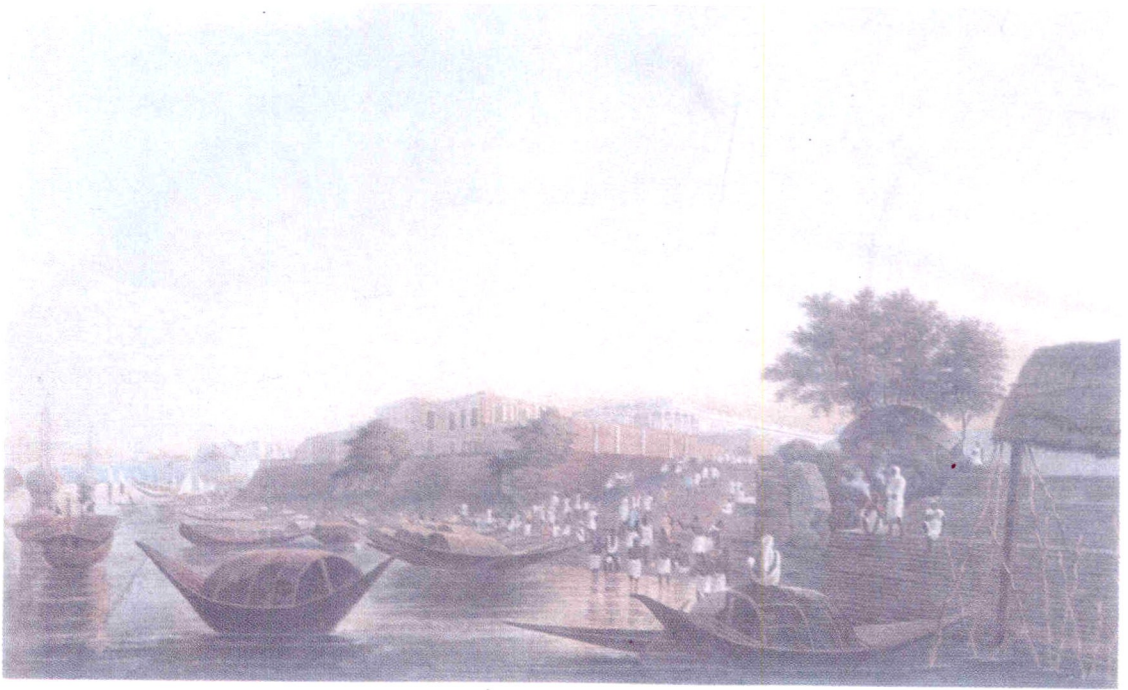
জ. ফ্রেজর

চাঁদপালঘাট

চ. ডয়লি

চিৎপুর বাজারে চালাঘর

ট. ড্যানিয়েল

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট
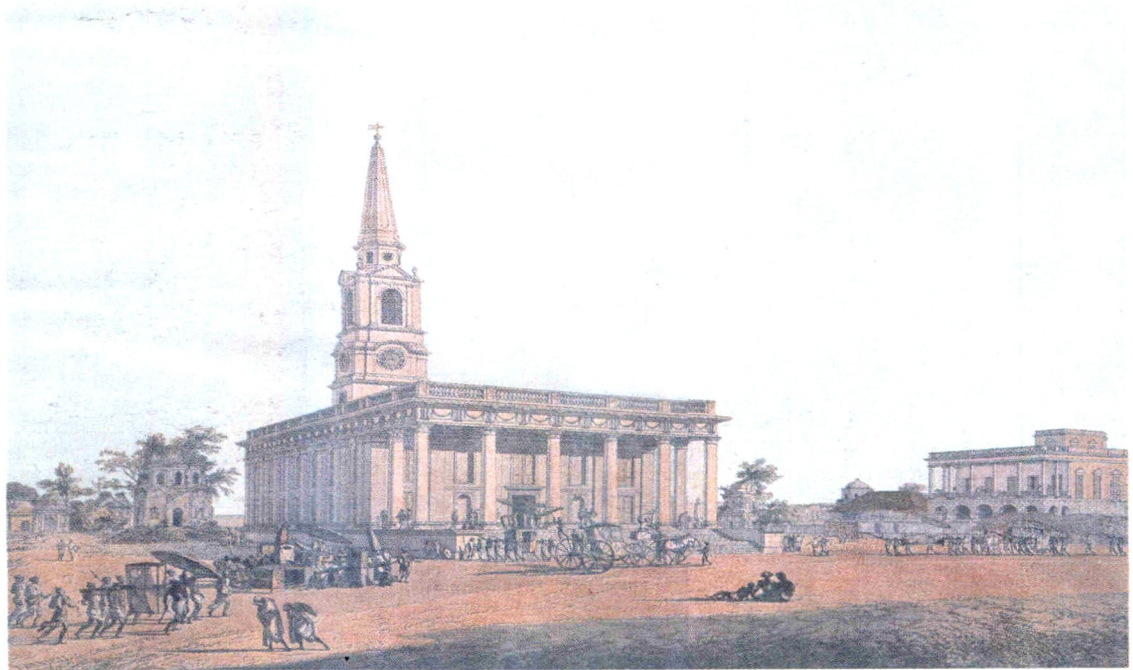
ট. ড্যানিয়েল

কলকাতার একটি চার্চ
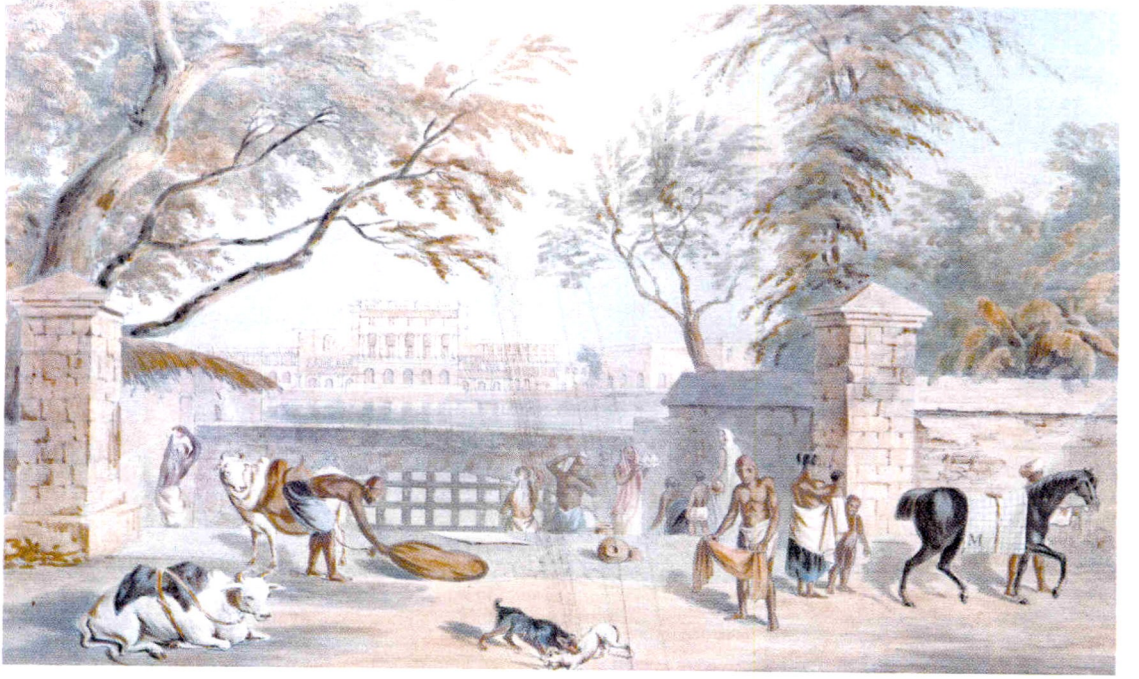
চ. ডয়লি

কর আদায়ের সরকারি দপ্তর, কিড স্ট্রীট
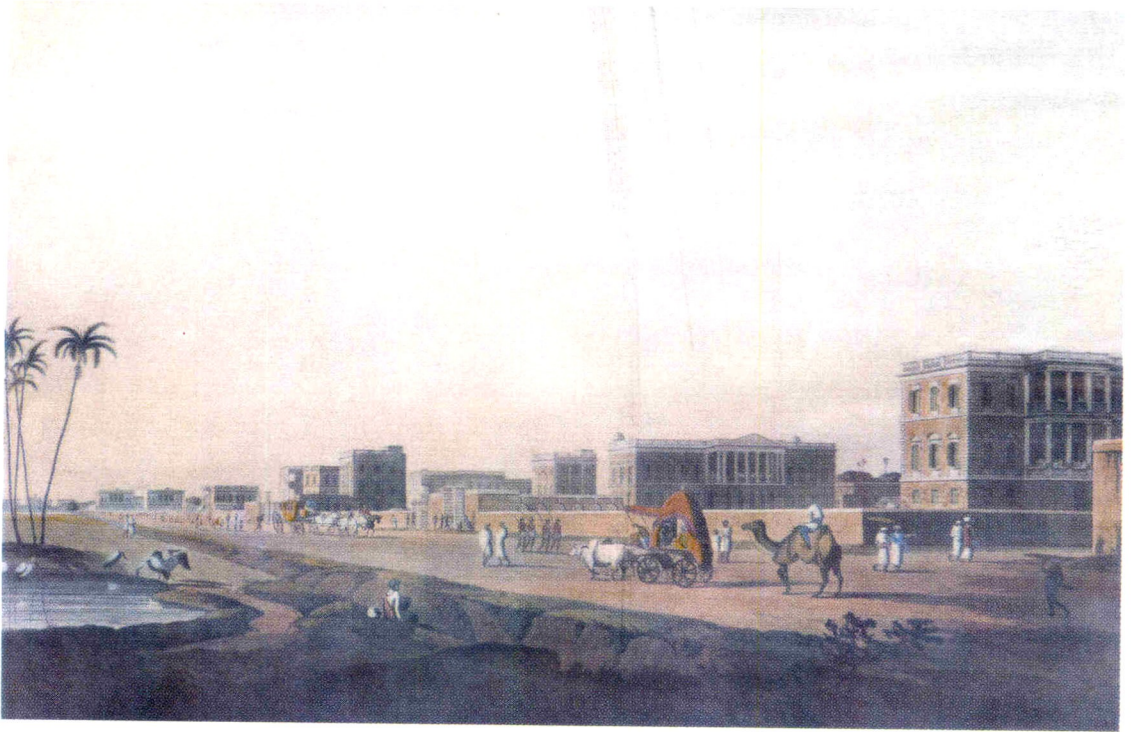
চ. ডয়লি

চৌরঙ্গীর একটি অংশ

জ. ফ্রেজর স্কটিশ চার্চ
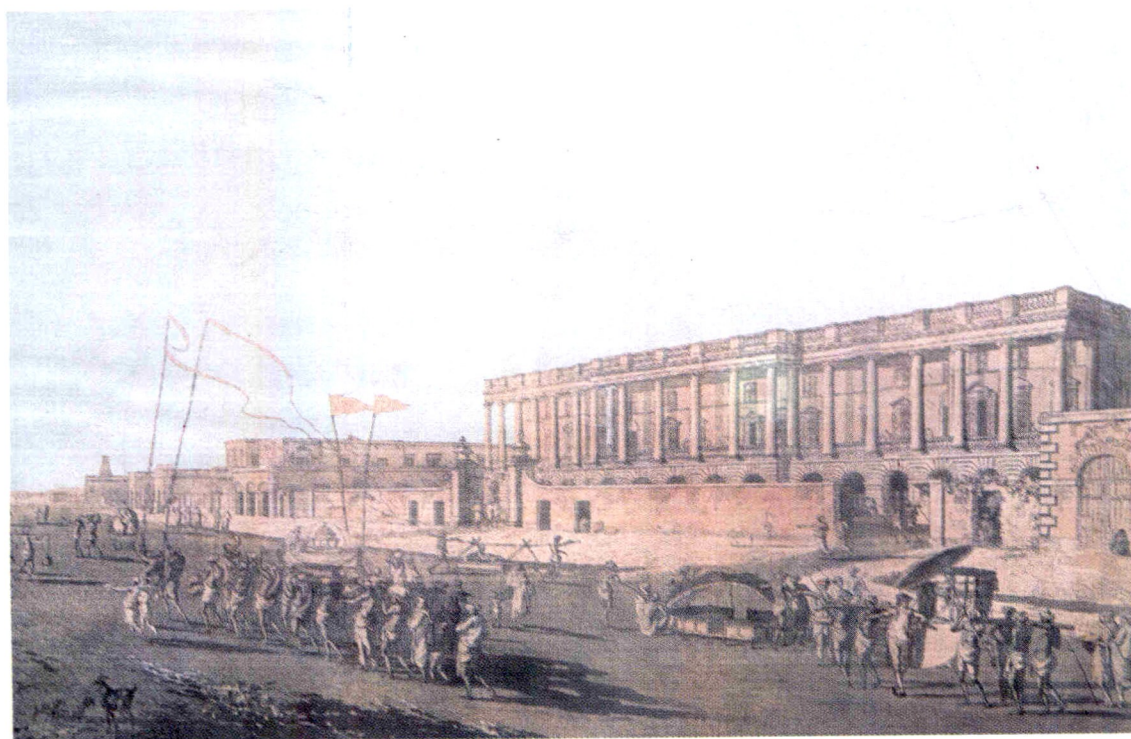
ট. ড্যানিয়েল হাইকোর্ট

ও. সিম্পসন

চিৎপুর রোড

ইন্টারনেট

চৌরঙ্গীর একটি অংশ